উদ্ধারণ দত্ত কথামৃত

দীনাতিদীন
শ্রীবৈদ্যনাথ ভৌমিক
আশ্রমপাড়া, পোঃ বাদকুল্লা, নদীয়া

UDDHARAN DUTTA KATHAMRITA
by Baidya Nath Bhowmik
Shyamsundar kutir
Ashrampara, P.O.- Badkulla, Dist.- Nadia (West Bengal)

প্রকাশিকা - **শ্রীমতী সুচিত্রা ভৌমিক,** আশ্রমপাড়া,
পোঃ বাদকুল্লা, নদীয়া।

প্রথম প্রকাশ - উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের তিরোভাব তিথি (অগ্রহায়ণী কৃষ্ণা দ্বাদশী) ১৪২১ বঙ্গাব্দ

মুখ্যপ্রাপ্তিস্থান - * ইমলিতলা মহাপ্রভুর মন্দির, সেবাকুঞ্জ মহল্লা, পোঃ - বৃন্দাবন, জি-মথুরা (উত্তর প্রদেশ)।
* সিদ্ধবকুল মঠ, বালিসাহি, পুরী।
* মহেশ লাইব্রেরী, ২/১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কোলকাতা - ৭০০০৭৩।
* সত্যনারায়ণ ভাণ্ডার, শ্রীবাস অঙ্গন রোড, পোঃ- নবদ্বীপ, নদীয়া।
* শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মস্থান আশ্রম, প্রাচীন মায়াপুর, নবদ্বীপ।
* শ্রীশ্রী সোনার গৌরাঙ্গ মন্দির, নবদ্বীপ, নদীয়া।
* কল্যাণী পেপার এণ্ড বুক হাউস, পলাশীপাড়া, নদীয়া।
* শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুরের মন্দির, ফুলিয়-বয়রা, নদীয়া।
* ভৌমিক ষ্টোর্স, বাদকুল্লা বাজার, নদীয়া।
* শ্রী জগন্নাথ ভৌমিক, আশ্রমপাড়া, বাদকুল্লা, নদীয়া। মোঃ ৯৯৩৩৫৭৬৭৬৪
* জয় মা তারা আয়ুর্বেদিক ঔষধ ও ধর্মগ্রন্থালয়, ষ্টেশনরোড, বাদকুল্লা, নদীয়া, মোঃ- ৯৯৩৩৮২১৫৮৫/ ৯৪৩৪১৯৯৩০২
* শ্রীশ্রীগৌর গিরিধারী মন্দির, চাঁদড়া, নদীয়া।

কম্পিউটারে বর্ণস্থাপন - 'মাধবী প্রিন্টিং ওয়ার্কস', দেবাশীষ সাধুখাঁ
সুরভীস্থান, বাদকুল্লা, নদীয়া। মোঃ ৯৮৫১৭০৭১৬৭

মুদ্রণ — মহামায়া প্রেস এণ্ড বাইণ্ডিং
২৩, মদন মিত্র লেন, কোল-৬, ফোন - ০৩৩ ২৩৬০ ৪৩০৬

উৎসর্গ

নমি নিত্যানন্দ প্রভু শতকোটি বার,
উদ্ধারণ দত্ত কথা মহিমা তোমার।
বৈষ্ণবের স্থান জাতিবর্ণের উপরে,
প্রত্যক্ষ দেখালে তাহা দয়ার্দ্র অন্তরে ॥
তোমার করুণাকথা এ গ্রন্থের প্রাণ,
বর্ণি সে করুণা নাই মোর সেই জ্ঞান।
তবোদ্দেশ্যে গ্রন্থখানি উৎসর্গ করিয়া,
যাচি কৃপা হে দীনেশ প্রভু মরমিয়া।

– দীন বৈদ্যনাথ

গ্রন্থ প্রশস্তি

উদ্ধারণ দত্ত কথামৃত পড়িলে আনন্দ চিত্ত
হইবেই ভকত ভ্রমর,
অভিন্ন গৌরাঙ্গ অঙ্গ নিত্যানন্দ প্রসঙ্গ
গ্রন্থমধ্যে বর্ণিত বিস্তর।
জাতিবর্ণ কিছু নয় নামে হয়প্রেমোদয়
সর্বশ্রেষ্ঠ নামাশ্রয়ী জন,
শাস্ত্রের মর্মার্থ যাহা নিত্যানন্দে স্পষ্ট
তাহা
সাক্ষী তার দত্ত উদ্ধারণ।
উদ্ধারণ দত্ত কথামৃত অমিয় মধুর গীত
বৈদ্যনাথ ভৌমিকের ভাষা,
পড়িলে সুকৃতিজনে আনন্দ পাইবে মনে
টুটাইবে সংসার পিপাসা।
দত্ত ঠাকুর উদ্ধারণ বন্দি তব শ্রীচরণ
কৃপা কর ভক্তিধন দানি,
তোমার জীবন বাণী যে দিল সম্মুখে আনি
দাতা মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই দানী।
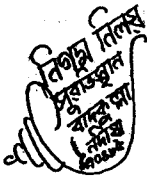
বিনয়াবনত
শ্রী গুরুচরণাশ্রিত
শ্রী অতুল বিশ্বাস

(উদ্ধারণ কথামৃতের মধুধারা)

– প্রভুপাদ শ্রীবিনোদ কিশোর গোস্বামী

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপাসঙ্গোৎসবে বিশেষভাবে যে দুইটি নাম স্মরণীয় তন্মধ্যে রঘুনাথ দাস ও উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের নাম উল্লেখযোগ্য। মরমিয়া সুযোগ্য ভক্ত চারিতালেখ্য নির্মাণশিল্পী সার্থকনামা শ্রীবৈদ্যনাথ ভৌমিক মহোদয়ের নাম একালে সুবিখ্যাত।

ভক্তপ্রবর শ্রীবৈদ্যনাথ ভৌমিক মহোদয় রচিত গ্রন্থাবলীর অন্যতম "উদ্ধারণ দত্ত কথামৃত" সমাজের হিংসা দ্বেষ হীন চক্রান্তের নিম্ন মানসিকতা হইতে উদ্ধারের কল্যাণ পথপ্রদর্শকরূপে ব্যক্তি জীবনের উৎকর্ষময় নিরভিমান ভক্তিচৈতন্যময় নামমধুর জীবনের সাত্ত্বিক সন্ধানের পথ পরিচয় প্রদাতারূপে অভিনব এই গ্রন্থমহিমা। ইহা "দিবাকর" হইতে অজস্র কিরণাবলী অকৃপণ উদারদান মহিমা রহস্য উদ্ঘাটনে সকল জীবের উদ্ধারণ বার্তাময় নামকারী প্রেমমহাজনরূপে নবনামে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু তাঁহার নামের গৌরব রহস্যকে উদ্ঘোষিত করিলেন। সুবর্ণকুলতিলক দিবাকর দত্ত নামের পরিবর্তন অর্থাৎ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মানসকৃপার দান "উদ্ধারণ" শব্দ রহস্যে আমরা দেখিতে পাই দিবাকরের প্রখরতেজ দহনজ্বালা পরিবর্তিত হইয়া জগৎ উদ্ধারের প্রাণভূমিকা গ্রহণকারী রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন।

সুবর্ণকুলকে অস্পৃশ্যতার মহাষড়যন্ত্র হইতে মুক্ত করিয়া নাম প্রেমে সমাজ সংস্কারের নির্ভীক দৃঢ়চেতা পুরুষরূপে নিঃশব্দ ভাব বিপ্লবের চলমান বিগ্রহ নামমাতোয়ারা নিত্যানন্দপ্রভুর কৃপাশক্তিসঞ্চারে যথার্থ নামধনে ধনী উদ্ধারণ, দানবৈভবে যশস্বী উদ্ধারণ, দিব্যনামপ্রেমমাতোয়ারা উদ্ধারণ, শ্রীনিত্যানন্দৈকশরণমূর্তি উদ্ধারণ, ভাবসংলালিত চিত্তে নিরহঙ্কার দৈন্যমুক্তায় ভূষিত উদ্ধারণ, ভক্তিসাধনার জগতে নিষ্ঠাপূত সদাচার বলিষ্ঠ অন্তর উদ্ধারণ, দৈন্য ভাবসাধনার জগতে এক অবিস্মরণীয় নাম। সমগ্র জীবনব্যাপি নামসাধন, সদাচার পালন, সাত্ত্বিক আহার, বৈষ্ণবসাধুসেবায় মহোৎসবে ধনসম্পদের সার্থকতা সম্পাদনে সন্তোষমনা আনন্দিত চিত্ত এই মহাজনের নাম "ঠাকুর" উপাধিতে চির দৃপ্ত। উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের অনুপম জীবন নাট্য কথাকোবিদ শ্রীবৈদ্যনাথ ভৌমিক মহোদয় অতি অপূর্বদরদী অন্তরে অনুপম রসানুভবে

অনুরাগের প্রেমের তুলিকায় অঙ্কিত করিয়াছেন। রসায়িত অন্তরের প্রেমব্যাকুলতার মূর্তি উদ্ধারণ, নাম প্রেমে নৃত্যদোলায় ভাবকদম্বে সুসজ্জিত তনুধারী উদ্ধারণ, রন্ধন কার্য্যে সুনিপুণ আদরনিষ্ঠাযুক্ত উদ্ধারণ, 'শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশের বিবাহ মঙ্গলের মুখ্যভূমিকায় উদ্ধারণ, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অলৌকিক দিব্যপ্রকাশে মৃতা বসুধার প্রাণসঞ্চারে চিরসাক্ষী উদ্ধারণ, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অপ্রাকৃত ঐশীশক্তির প্রয়োগ করুণায় ডাল রন্ধনের শুষ্ক কাষ্ঠ খণ্ডে মালতী লতার কচিপাতা উদগমে বিস্মিত উদ্ধারণ, শাঁখারীর হস্ত হইতে উদ্ধারণ দত্তের কন্যা পরিচয়ে গঙ্গাদেবীর শাঁখা হস্তে পরিধানের বিস্ময়কর ঘটনা, নূপুর কুণ্ড প্রভৃতির বিস্তৃত আলোচনার চিত্তাকর্ষক ঘটনাবলীর রূপকার বৈদ্যনাথ ভক্তবরের নিষ্ঠাসজাগ অনুসন্ধানবৃত্তি সাধনোজ্জ্বল জীবনের একটি মৌনছবির মুখর রূপ দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হই। শব্দচিত্র অঙ্কনে লেখক ভক্তের সাবলীলতা, মনোহারীত্ব, সৌন্দর্যমাধুর্যমণ্ডিত শ্রীস্নিগ্ধ শব্দলালিত্য আমাদের মনকে দিব্যচিন্তনজগতে উধাও করিয়া থাকে। শ্রীলকৃষ্ণদাস কবিরাজকৃত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ৪০০শত তমপূর্তি বার্ষিক স্মরণমঙ্গল সমারোহ এই গ্রন্থের প্রকাশ দিকে দিকে মহাপ্রভুর প্রিয়পার্ষদ পাঠকগণের মাহিমা প্রচারের মঙ্গলদীপ প্রজ্জ্বলনের আরতির প্রদীপমালায় সংযুক্ত হউক। সেকালের সুবাহু গোপাল একালে উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর।

শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুর অপ্রকটের পর জাহ্নবাদেবীর সহিত ব্রজবন বিহার পরিক্রমার অধ্যায়টি সুমধুরভাবে শ্রী বৈদ্যনাথ ভৌমিক মহোদয় সমুজ্জ্বল চিত্রটি উপহার প্রদান করিয়াছেন। শ্রীমন্ নিত্যানন্দ শক্তি জাহ্নবা দেবীর গমনভঙ্গিমা, অগ্রে উদ্ধারণের অবস্থিতি এবং পশ্চাতে পণ্ডিত রামাইয়ের অনুসরণ লীলাস্মরণের অবকাশে মহাপ্রভুর পার্ষদবৃন্দের অন্যতম রূপ সনাতনের স্মৃতির প্রত্যক্ষানুভব, কথোপকথন, লীলারসাখ্যান তত্ত্বমাধুরী, ষড়ভুজ মহাপ্রভুর প্রতিষ্ঠা গ্রন্থের সাত্ত্বিক প্রসন্নতার স্নিগ্ধ লাবণ্য মাধুরী আস্বাদনের স্বর্ণকপাট উন্মোচিত করিয়াছে। এই গ্রন্থে একত্রে নদীয়ালীলা ও ব্রজলীলার মহামাধুরী যুগপৎ আস্বাদন করিয়া ধন্য হই। সাধক রামপ্রসাদের মায়ের হস্তে শাঁখা প্রদানের চিরন্তন অলৌকিক রসাস্বাদনে স্নিগ্ধ অনুরাগের ভাবনৈকট্যের কথা মনে জাগিয়া থাকে। তা'ছাড়া বহুদর্শী অনুভবসমৃদ্ধ সুনিপুণ দিব্যভাবামৃত সংগ্রহ নিপুণ আগ্রহী লেখকের অকৃপণ শব্দাধারে দিব্য অমৃত অক্ষরের মধুধারায় আমরা মানস পরিতৃপ্তি লাভ করি। গ্রন্থকারের অসাধারণ মনস্বিতা, গ্রন্থ গ্রন্থনে শ্রদ্ধা বিমণ্ডিত দিব্যহর্ষোজ্জ্বল প্রকাশমাধুরী তদুপরি

মধুস্নেহের অমৃত বৃষ্টি আমাদের প্রাণকে এক অজানা লোকে অভিসার করায়। শ্রীবৈদ্যনাথ ভৌমিকের সাধকোচিত প্রত্যক্ষ কৃপার দান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপাধন্য বিভিন্ন ভক্ত চরিত্রচরিতালেখ্য নির্মাণের ফলশ্রুতি। তাঁহার যে কোন বৈষ্ণব মহাজনের চরিত্র নির্মাণের প্রাণনন্দিত দিব্যকথামৃতে সুদূরের কাহিনীরাজিকে প্রত্যক্ষীভূত করিবার অলক্ষ্যে বর্ষিত ভগবৎ কৃপামণ্ডিত বাক্যবলীর জীবন্ত রূপচ্ছবি আমাদের অন্তর চেতনার প্রাণোজ্জ্বল প্রবাহকে দিব্যামৃতে অভিষিক্ত করে শুধু নয় পাঠক-পাঠিকাবর্গকে এক অসাধারণ প্রেমভূমিতে মানস পরিক্রমার অপ্রাকৃত সুখাভিলাষকে জাগ্রত করে। সংসার তাপক্লিষ্ট জীব ভগবান ও ভক্তের মিলন লীলাসুখদ সরোবরে বিহারের সুদুর্লভ সৌভাগ্যলাভ করিয়া ধন্য ও প্রসন্নতা লাভ করিবে সন্দেহ নাই। এই জাতীয় গ্রন্থ ব্যক্তিচরিত্র, জাতীয় চরিত্র, রাষ্ট্রীয় স্বভাব চরিত্রনীতি নির্মাণের মহাগ্রন্থ। এই জাতীয় গ্রন্থ ব্যক্তিস্বভাব গঠনের আদর্শময় অমূল্য জীবনের ভাবাদর্শের আলোকস্তম্ভ সদৃশ। সৎসাহিত্য অনুশীলনের যথার্থ পথের নির্দ্দেশনায় ব্যক্তি জীবন, সমাজ জীবন ও রাষ্ট্রজীবনকে সুপথে পরিচালিত করিবার স্মরণীয় আলোকবর্তিকারূপে এই মহাগ্রন্থ মানবের মানসভাবনাকে প্রেমস্নিগ্ধ মাধুর্য্যের সন্ধান প্রদান করুক, শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ প্রভুযুগলের চরণতলায় এই প্রার্থনা রাখিলাম।

তাং ১লা অগ্রহায়ণ
১৪২১ বঙ্গাব্দ
শ্রীভূমি, কোলকাতা - ৪৮

নিত্যশুভার্থী
মহৎ সঙ্গাভিলাষী ভক্তচরিত্র আস্বাদনে
নন্দিত চিত্তমধুকর শ্রীমন্নিত্যানন্দবংশ্য
শ্রীবিনোদ কিশোর গোস্বামী এম.এ
ভাগবত ভগীরথ, সাহিত্য ব্যাকরণতীর্থ, পুরান রত্ন
সভাপতি - চালবাগান গৌড়ীয় বৈষ্ণব
সম্মিলনী, আচার্য বঙ্গীয়ভাগবত সমাজ, হাওড়া
গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনী, করিমগঞ্জ সংহতিভারতী
সন্তমন্দির (প্রতিষ্ঠাতা) কৃষ্ণপুর শ্রীনিতাই গৌর
রাধাবল্লভ জিউ-মন্দির,দিগ্‌দাপ্রাণগৌরহরি
নিত্যানন্দ সেবাশ্রম, হাইলাকান্দি শ্রীগৌরাঙ্গ মন্দির,
সাহারাপাড়া জলেশ্বর, উড়িষ্যা–শ্রীনিতাইগৌর
জগন্নাথজিউ মন্দির।

ঠাকুর শ্রীউদ্ধারণ

গৌড়ীয় বৈষ্ণবজগতে শ্রীমৎ উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর বিশেষ স্মরণীয় একটি পরমোজ্জ্বল নাম। তৎকালীন গৌড়দেশের সমৃদ্ধ নগরী সপ্তগ্রামের বিত্তশালী এক সুবর্ণবণিক পরিবারে তাঁর জন্ম গ্রহণ। তাঁর পিতৃদেব পরমভক্তিমান শ্রীকর দত্ত এবং মাতৃদেবী পরমভক্তিমতী ভদ্রাবতী দেবী। তাঁর পারিবারিক নাম ছিল দিবাকর দত্ত। পরবর্তী কালে শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভু তাঁকে কৃপা করেন এবং কর্ণে মন্ত্র দান করে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত করেন। তাঁর নামকরণ করা হয় উদ্ধারণ দত্ত। এই নামেই সারা জগৎ তাঁকে চেনে। শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকা মতে তিনি হলেন দ্বাপরের শ্রীধাম বৃন্দাবনের দ্বাদশ গোপালের একজন।

শ্রীভগবান ও তাঁর নিত্য পরিকরেরা যুগে যুগে অবতীর্ণ হ'ন দিশাহারা জগৎকে দিশা দেখাতে, অজ্ঞানান্ধকারে আলো দেখাতে এবং জগৎবাসীর প্রাণে প্রাণে প্রেমের প্রদীপ জ্বালাতে। বর্তমান কলিযুগে এইরূপ একজন আলোকদিশারী হলেন পরমবৈষ্ণব মহাভাগবত উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর। তাঁর গৌরবোজ্জ্বল মহাজীবনের পাঠমন্দির হ'তে আমরা শিক্ষণীয় অনেক কিছুই পাঠ নিতে পারি। যে পাঠ গ্রহণে আমাদের আত্মকল্যাণ তো বটেই, সেই সঙ্গে জগৎ কল্যাণও অবশ্যম্ভাবী। ঠাকুর শ্রীউদ্ধারণ ধনীগৃহে জন্মলাভ করলেও ধনৈশ্বর্যের অহঙ্কার তাঁর মধ্যে বিন্দুমাত্র ছিল না। কারণ বিষয়-বৈভব ঈশ্বরের দয়ার দান। তাঁর সদ্ব্যবহার অবশ্য কর্তব্য। তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বিশাল ধনৈশ্বর্যের সুষ্ঠু সংরক্ষণ, দীন-দুঃখীদের অকাতরে দান, দেব-দ্বিজে সশ্রদ্ধ সেবা, দুর্ভিক্ষে অন্নসত্র ও ভগবৎ নামপ্রেম প্রচারে বিপুল অর্থব্যয় করে জগতে মহৎ দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন। অন্তরে বিশুদ্ধ ভাবভক্তি, সাক্ষাৎ শ্রীনিত্যানন্দ চরণকমলে অত্মোৎসর্গ, রাধাকৃষ্ণ মন্ত্রলাভ, স্বগৃহে সপার্ষদ শ্রীগুরুর সেবা, উদ্দণ্ড মহানাম সংকীর্তন ও নগরে নগরে নামপ্রেম প্রচার তাঁর জীবনকে মহাজীবনে অলংকৃত করেছে। সেইসঙ্গে তদানীন্তন সামাজিক বিচারে অধঃপতিত সুবর্ণবণিককুলকেও সমুদ্ধার ক'রে জগতে প্রমাণ করেছেন – বৈষ্ণবের কোন জাতি বর্ণ নাই। বৈষ্ণব নিত্য কৃষ্ণদাস। তদীয় গুরুকৃপায় ডাউল রন্ধনের কাষ্ঠ হাতা থেকে অলৌকিক ভাবে সৃষ্ট অপ্রাকৃত মাধবীলতা অদ্যাপিও সপ্তগ্রামে দত্ত ঠাকুরের শ্রীপাটে অবস্থান ক'রে অতীতের সেই মহিমোজ্জ্বল স্মৃতি বহন করে চলেছে।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর নির্দেশক্রমে নিত্যানন্দ প্রভু বিবাহে সম্মতি দান করলে দত্ত ঠাকুরই মহোদ্যোগী হয়ে দেশ জুড়ে উপযুক্ত পাত্রী অন্বেষণে তৎপর হয়ে উঠেন। অবশেষে অম্বিকা কালনায় সূর্যদাস পণ্ডিতের গৃহে কন্যার সন্ধান পান। কিন্তু বর্ণাশ্রম বাধা হেতু অবধূত সন্ন্যাসীর হাতে কন্যা সম্প্রদানে সূর্যদাস গররাজি হন। অতঃপর অলৌকিক ঘটনার মধ্য দিয়ে তাঁর দুই কন্যা বসুধা ও জাহ্নবার সঙ্গে প্রভুর বিবাহ সম্পন্ন হয়। এই শুভ পরিণয়ে দত্ত ঠাকুর দশ হাজার টাকা ব্যয় করে ধন্যাতিধন্য হয়েছিলেন। পরবর্তী কালে তদীয় গুরুদেব শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভুর আনুগত্যে তিনি স্বকীয় সাধনভজনে এবং নামপ্রেম প্রচারেই আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর অমিয় স্মৃতিধন্য সপ্তগ্রামের শ্রীপাট, উদ্ধারণপুরের শ্রীপাট, শাঁখাই বাজার প্রভৃতি স্থানগুলি অদ্যাপিও সগৌরবে বিরাজমান। শ্রীধাম বৃন্দাবনে তিনি দেহরক্ষা করেন এবং বংশীবটে সমাহিত হ'ন। সেই পুণ্য সমাধি এবং সপ্তগ্রাম ও উদ্ধারণপুরের পুষ্প সমাধি আজিও অগণিত ভক্তভৃঙ্গের শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করছে।

এই প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষের দিব্য জীবনী অবলম্বনে আমার পরমশ্রদ্ধাস্পদ বৈষ্ণব গ্রন্থকার শ্রী বৈদ্যনাথ ভৌমিক মহোদয় তাঁর সুনিপুণ ললিত লেখনীতে "উদ্ধারণ দত্ত কথামৃত" গ্রন্থখানি প্রণয়ন করেছেন। আলোচ্য গ্রন্থগর্ভে উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর মহাশয়ের আবির্ভাব থেকে তিরোভাব পর্যন্ত বিস্তৃত জীবন কথামৃত বিভিন্ন প্রাচীন আকর গ্রন্থের নির্যাস সমৃদ্ধ হয়ে সুধী ভক্ত পাঠক পাঠিকাবৃন্দের দরবারে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে। বর্তমান পুণ্যস্মৃতি বিস্মৃতির যুগে মাননীয় গ্রন্থকারের এই সাধু প্রয়াস প্রশংসনীয় এবং অভিনন্দনযোগ্য। ইতিপূর্বে তাঁর প্রণীত কলিযুগের আলো, নামচিন্তামণি, লক্ষহীরা উদ্ধার, পৃথিবীর শিরোমণি হরিদাস, গম্ভীরালীলায় মহাপ্রভু, হরিদাস নির্যাণ, পানিহাটি চিড়াদধি মহোৎসব, সিদ্ধবকুল মাহাত্ম্য প্রভৃতি অমূল্য গ্রন্থগুলি জগৎকল্যাণে প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থকারের শিরোপরে শ্রীভগবানের অশেষ করুণা বর্ষিত হচ্ছে সন্দেহ নাই। আশা করি তাঁর এই নবীনতম গ্রন্থখানিও অধ্যাত্মরসপিপাসু পাঠকপাঠিকাগণের তৃষ্ণা নিবারিত করে নামানন্দে উৎসাহিত করবে। জয় নিতাই, জয় গৌরাঙ্গ, জয় ঠাকুর শ্রীউদ্ধারণ!

আদ্যাপীঠ আশ্রম
তাং- ৪ঠা অগ্রহায়ণ (১৪২১ বঙ্গাব্দ)

দীনাতিদীন
ব্রহ্মচারী বিদ্যুৎ ভাই

বিনম্র নিবেদন

ভক্তকণ্ঠে কলিযুগপাবনাবতার শ্রীমন্‌চৈতন্য মহাপ্রভুর মধ্যাহ্নকালীন ভোগারতি কীর্তনের প্রথমেই- **"ভজ পতিত উদ্ধারণ শ্রীগৌরহরি"** এই উক্তিটি যখন শুনিতে পাই তখন উক্তিস্থিত "উদ্ধারণ" শব্দটি আমাকে নিত্যানন্দ কৃপাধন্য উচ্চকোটি ভক্তপ্রাণ উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ইহার কারণ, আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি মহাপ্রভু এবং নিত্যানন্দ প্রভু যেমন পতিত উদ্ধারক, অনুরূপভাবে তাঁহাদের অচিন্ত্যশক্তিতে শক্তিমান অথবা অন্যার্থে তাঁহদের কৃপাধন্য উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরও তেমন পতিত উদ্ধারক। অর্থাৎ মহাপ্রভু এবং নিত্যানন্দ প্রভু এই দুই পতিতোদ্ধারক প্রভুর মত উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরও নামপ্রেম প্রচারের মাধ্যমে কত স্থানে কত অসংখ্য পতিতপ্রাণকে যে উদ্ধার করিয়াছেন তাহারও কোন সুনির্দিষ্ট সীমা সংখ্যা নাই।

যাহা হউক, কিছুদিন পূর্বে মহাসৌভাগ্য ক্রমে পতিতপাবন নিত্যানন্দ প্রভুর নিত্যপার্ষদ উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের শ্রীপাট দর্শনেচ্ছায় হুগলী জেলার আদিসপ্তগ্রামে যাই এবং সেখানে তৎকালীন সময়ে উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত ও সেবিত শ্রীবিগ্রহ, দত্ত ঠাকুরের সমাধি, নিত্যানন্দ প্রভু কর্তৃক ডাউল রন্ধনের কাষ্ঠ হাতা হইতে অত্যলৌকিক সৃষ্ট মাধবীলতা, নুপূর কুণ্ড প্রভৃতি নয়নমনোহর দৃশ্যাবলী অবলোকনে অত্যন্ত আনন্দানুভব করি এবং সপ্তগ্রামে সপার্ষদ নিত্যানন্দ প্রভু ও উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের অমিয় মধুর দিব্যলীলাবলী আমার মনের পর্দায় ঠিক যেন টিভির পর্দার মতই একের পর এক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতে থাকে। এই অবস্থায় আমি ভাবি অহৈতুকী করুণার অতলতল অনন্ত মহাসিন্ধু নিত্যানন্দ প্রভু যদি নিজগুণে এই অধমকে একটু কৃপা করিতেন তবে এখনকার মনোপর্দায় ভাসমান এই সমস্ত বিষয়গুলিই কাগজে কলমে পর পর সাজাইয়া একখানি গ্রন্থ রচনা করিতে পারিতাম। মাদৃশ অধমের এই ভাবনার সোনালী ফসল নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা প্রাপ্ত বর্তমান এই গ্রন্থখানি।

এই গ্রন্থখানি রচনা করিতে করিতে প্রখ্যাত প্রাতঃস্মরণীয় বৈষ্ণবাচার্য শ্রীল রাধাগোবিন্দ নাথ মহোদয় বিরচিত শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতের ব্যাখ্যা সমন্বিত **"নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা"**, খ্যাতনামা ভক্তপ্রাণা লেখিকা রেণুকা

মল্লিক প্রণীত **"উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের জীবনালেখ্য"**, স্বনামধন্য সুনিপুণ লেখক অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত রচিত **"গৌরাঙ্গ পরিজন"** প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে যথেষ্ট সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি।

পরমপূজ্যপাদ প্রভুপাদ শ্রীল বিনোদ কিশোর গোস্বামী মহামহোদয় নিজগুণে কৃপা পূর্বক এই গ্রন্থের একটি সুরসাল ভূমিকা লিখিয়া গ্রন্থখানির উৎকর্ষ বর্দ্ধিত করিয়া দিয়াছেন।

অশেষ শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাত্ম শিক্ষাচার্য খ্যাতনামা কবি ও লেখক শ্রীঅতুল বিশ্বাস মহোদয়ের প্রাণঢালা সহযোগিতাতেই যে গ্রন্থখানি এত সুন্দর প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে তিলার্দ্ধ পরিমাণেও সন্দেহের স্থান নাই।

আমার পরম প্রীতিভাজন ব্রহ্মচারী বিদ্যুৎ ভাই প্রাণঢালা প্রযত্নে প্রুফ দেখিয়া গ্রন্থখানিকে অধিকতর প্রাণোজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন।

গ্রন্থখানির প্রকাশনায় পরমভক্তপ্রাণ রজতকান্তি সরকার মহোদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা সবিনয়ে স্মরণ করি।

পরমকরুণাময়ের শ্রীচরণকমলে উল্লেখিত প্রত্যেকের আত্যন্তিক কল্যাণ প্রার্থনা করি।

ইতি–

দীনাতিদীন

শ্রীবৈদ্যনাথ ভৌমিক

আশ্রমপাড়া, বাদকুল্লা, নদীয়া

৫ই অগ্রহায়ণ ১৪২১ (বঙ্গাব্দ)

উদ্ধারণ দত্ত কথামৃত

গ্রন্থারম্ভ

সমগ্র অধ্যাত্ম জগতে ইহা একটি অত্যন্ত সুবিদিত কথা যে, নীলাচলে অবস্থানকালীন শ্রীমন্ চৈতন্য মহাপ্রভু তাঁহার প্রাণাধিক প্রিয় শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভুকে গৌড় দেশে যাইয়া অলিতে গলিতে ঘরে ঘরে গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নামপ্রেম দানে দীন হীন কাঙ্গাল অধম পতিত সকলকেই উদ্ধার করিতে অনুজ্ঞা করিয়াছিলেন। আর এই অনুজ্ঞায় পতিতপাবন নিত্যানন্দ প্রভু নীলাচল হইতে গৌড় দেশে আসিয়া সর্বপ্রথম পানিহাটি রাঘব ভবনে উঠিয়াছিলেন এবং সেখানে অবস্থানপূর্বক একটানা তিনমাস ধরিয়া পানিহাটি এবং গঙ্গার উভয় তীরবর্তী গ্রামগুলিতে সপার্ষদে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাম প্রেম প্রচার করিয়াছিলেন। সেই সময়ে বিশ্ববরেণ্য বৈষ্ণব চূড়ামণি শ্রীল রঘুনাথ দাসকে কৃপা করিতে নিত্যানন্দ প্রভু পানিহাটি গঙ্গাতীরে বটবৃক্ষের তলদেশে যে এক ঐতিহাসিক চিড়াদধি মহোৎসব সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন তাহা উত্তরোত্তর অধিক সমারোহে অদ্যাপিও অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে।

যাহা হউক, তৎকালীন সময়ে সপার্ষদ নিত্যনন্দ প্রভুর নাম প্রচারের একটি কথাচিত্র প্রখ্যাত পদকর্তা প্রেমদাস মহোদয় এইভাবে অঙ্কন করিয়াছেন–

"চৈতন্য আদেশ পাঞা নিতাই বিদায় হৈয়া
আইলেন শ্রীগৌড় মণ্ডলে।
সঙ্গে ভাই অভিরাম গৌরীদাস গুণধাম
কীর্তন বিহার কুতূহলে ॥
রামাই সুন্দরানন্দ বাসু আদি ভক্তবৃন্দ
সতত কীর্তন রসে ভোলা।
পানিহাটি গ্রামে আসি গঙ্গাতীরে পরকাশি
রাঘব পণ্ডিত সহ মেলা ॥
সকল ভক্ত লইয়া গৌর প্রেমে মত্ত হইয়া

বিহারয়ে নিত্যানন্দ রায়।
পতিত দুর্গতি দেখি হইয়া করুণা আঁখি
প্রেম রত্ন জগতে বিলায় ॥
হরিনাম চিন্তামণি দিয়া জীবে কৈল ধনী
পাপ তাপ দুঃখ দূরে গেল।
পড়িয়া বিষয় ফাঁদে না ভজি নিতাই চাঁদে
প্রেমদাস বঞ্চিত হইল ॥"

এইভাবেই তৎকালীন সময়ে শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভু গঙ্গাতীরবর্তী অসংখ্য গ্রামকে নামপ্রেমের অপ্রাকৃত অথৈ বন্যায় ভাসাইয়া অবশেষে তাঁহার পরিকরগণ সহ সপ্তগ্রামে আসিয়া উপনীত হইলেন এবং প্রথমেই সপার্ষদে ত্রিবেণী স্নান করিলেন। এখানে উল্লেখ্য, ত্রিবেণী শব্দটির 'ত্রি' অর্থে তিন এবং 'বেণী' অর্থে প্রবাহ। অর্থাৎ ত্রিবেণী বলিতে যেখানে তিনটি নদীর প্রবাহ একত্র মিলিত হইয়া থাকে সেই স্থানকে বুঝাইয়া থাকে এবং এই অর্থেই অধিকাংশ মানুষ এলাহাবাদে যে স্থানে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী এই তিনটি নদীর মিলন ঘটিয়াছে সেই স্থানকে বুঝিয়া থাকেন। ঠিক এই অর্থেই হুগলী জেলাতে যে স্থানে সুরধুনী গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর মিলন ঘটিয়াছে সেই স্থানটিও ত্রিবেণী নামে খ্যাত হইয়াছে। জনশ্রুতিতে জানা যায় বর্তমান সময়ে দৃশ্যমান ত্রিবেণীর সুদৃশ্য ঘাটটি খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে উড়িষ্যার গণপতি বংশীয় শেষ রাজা মুকুন্দদেব নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন।

এখানে আরও উল্লেখ্য, এই ত্রিবেণীতে সপ্তঋষিগণ তপস্যা করিয়া ভগবৎ চরণ লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া স্থানটি বহুপূর্বেই একটি তীর্থস্থানে পরিণত হইয়াছিল। তদুপরি সপার্ষদ নিত্যানন্দ প্রভু ত্রিবেণীতে স্নান করিবার কারণে তাহা মহাতীর্থে পরিণত হইয়াছে।

যাহা হউক, এখন সপ্তগ্রাম প্রসঙ্গে আসি। এই সপ্তগ্রামই প্রাচীনকালের সেই সুবিখ্যাত মহাসমৃদ্ধিশালী মহানগরী সপ্তগ্রাম। শুধু মহানগরীই নহে, তৎকালীন সময়ে সপ্তগ্রাম একটি সুবিখ্যাত বন্দরও ছিল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, হুগলী জেলার ত্রিবেণীতে ভাগীরথী নদী তিন বেণীতে ত্রিধারা বিভক্ত। পূর্ব বেণী যমুনা কাঞ্চনপল্লি বা আজকের কাঁচড়াপাড়া

কল্যাণীর ভিতর দিয়া প্রবাহিত। পশ্চিম বেণী সরস্বতী পশ্চিমে সপ্তগ্রাম ছাড়াইয়া কিছুদূরে দক্ষিণাভিমুখী। সিংহপুর বা আজকের সিঙ্গুর তটে রাখিয়া বেতর বা আজকের আন্দুল হইয়া পূর্বে হাতিয়াগড় বা আজকের ডায়মণ্ডহারবার কাকদ্বীপ, সাগর দ্বীপকে পূর্বে রাখিয়া কপিলমুনিতীর্থে বঙ্গোপসাগরে মিলিত হইয়াছে। দক্ষিণ বেণী ভাগীরথী সোজা দক্ষিণে ব্যাণ্ডেল, চুঁচুড়া, চন্দননগর, শ্রীরামপুর, কলকাতা, কালীঘাট, বারুইপুর, জয়নগর, মজিলপুর হইয়া চক্রতীর্থ খাড়িগ্রামে বঙ্গোপসাগরে মিশিয়াছে। তিনবেণীর মধ্যে সরস্বতী ছিল প্রবলতম। তাই সরস্বতী তীরে গড়িয়া বা সপ্তগ্রাম বন্দর গড়িয়া উঠিয়াছিল। সামুদ্রিক জাহাজ সরস্বতী দিয়া সপ্তগ্রাম বন্দরে আসিত। বর্তমান সময়ে ইষ্টার্ণ রেলওয়ের আদি সপ্তগ্রাম ষ্টেশনের নিকটেই তৎকালীন সময়ের সেই সপ্তগ্রামের অবস্থান। সেই সময়ে সপ্তগ্রাম বলিতে সপ্তগ্রাম, বংশবাটি, শিবপুর, বাসুদেবপুর, কৃষ্ণপুর, নিত্যানন্দপুর ও শঙ্খনগর এই সাতটি গ্রামকে বুঝাইত। মতান্তরে সপ্তগ্রামের পরিবর্তে শব্দকারা এবং শঙ্খনগরের পরিবর্তে বলদঘাটি হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন চাঁদপুরের নামান্তরেই কৃষ্ণপুর। জগদ্বিখ্যাত তীর্থস্থান ত্রিবেণীও এই সপ্তগ্রামেরই অঙ্গীভূত। এই সপ্তগ্রামের মহিমার অন্ত নাই। কোন ভক্তকবির কলমে সেই মহিমাসিন্ধুর এক বিন্দু –

"সপ্তঋষির বাসস্থান তেঞি আখ্যা সপ্তগ্রাম
খ্যাত তিহ সকল ভুবনে।
যার নাম লইলে হয় সপ্তজন্মের পাপক্ষয়
উক্তি বটে বেদে ও পুরাণে ॥"

এতদ্বিষয়ে কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে উল্লেখ আছে–

"সপ্তগ্রামের বণিক কোথাও না যায়।
ঘরে বসে সুখ মোক্ষ নানা ধন পায় ॥
তীর্থ মধ্যে পুণ্যতীর্থ ক্ষিতি অনুপম।
সপ্তঋষি শাসনে বলায় সপ্তগ্রাম ॥"

উল্লেখিত সপ্তঋষি বলিতে পুরাণে উল্লেখ আছে, প্রিয়ব্রত রাজার সাতপুত্র সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া যে সুপবিত্র সঙ্গম স্থলে অর্থাৎ যেখানে সুরধুনী গঙ্গা তাহার ভাগীরথী, যমুনা ও সরস্বতী নামক ত্রিধারায় পুনর্বিমুক্ত

হইয়া স্নেহসিক্ত বঙ্গভূমিকে পুণ্যবতী করিয়াছে, সেই মুক্ত ত্রিবেণীর অদূরে সপ্তগ্রামে তাঁহাদের স্ব স্ব সাধনার আসন পাতিয়া সুকঠিন তপস্যায় ব্রতী হইয়াছিলেন সেই সপ্তঋষিকে বুঝায়। সেই সপ্তঋষির সাধনস্থল বলিয়া তৎকালীন সময়ে হিন্দু রাজত্বকালে সপ্তগ্রাম একটি সুপবিত্র তীর্থক্ষেত্র রূপে সর্বত্র সুপরিচিত হইয়াছিল।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, ১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দে পাঠানগণ সপ্তগ্রাম লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যায়। তদুপরি ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে সরস্বতী নদীর স্রোত লুপ্ত হইয়া যাওয়ায় সপ্তগ্রামের সুপ্রসিদ্ধ বন্দরও ধ্বংস হইয়া যায় এবং এই কারণে সপ্তগ্রামের সেই গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য ধীরে ধীরে অবলুপ্তির পথে ধায়।

যাহা হউক, এই সপ্তগ্রামের অন্তর্গত ত্রিবেণীতে আসিয়া নিত্যানন্দ প্রভু তাঁহার পার্ষদবৃন্দ সহ গঙ্গায় স্নান করিলেন এবং স্নানান্তে একটি পাকুড় বৃক্ষের নীচে অবস্থান পূর্বক সপার্ষদে সুউচ্চ কণ্ঠে হরিনাম সংকীর্তন করিতে লাগিলেন। আর কাহার যেন আগমনের অপেক্ষায় পথের দিকে অধীর আগ্রহে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিলেন।

হে সহৃদয় পাঠকবৃন্দ! শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভু এখন এইভাবেই কিছুক্ষণ হরিনাম সংকীর্তন করিতে করিতে পথের দিকে তাকাইয়া থাকুন আর এই অবসরে আমরা তিনি কেন ও কাহার অপেক্ষায় রাস্তার দিকে তাকাইয়া থাকিলেন তাহার একটু খোঁজখবর করিয়া লই।

তৎকালীন সময়ে এই সপ্তগ্রামেই উদ্ধারণ দত্ত নামে একজন উচ্চকোটির ভগবদ্ভক্ত বাস করিতেন, যিনি ছিলেন শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুর নিত্যকালের অতীব অন্তরঙ্গ পরিজন। উল্লেখ আছে, শ্রীনিত্যানন্দ যখন জগতে অবতীর্ণ হন তখন শ্রীউদ্ধারণও অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ বলরামের সুবাহু নামক গোপালই এই উদ্ধারণ দত্ত। একটু বিশদভাবে বলা যায় – ব্রজে শ্রীদাম, সুদাম, দাম, বসুদাম, সুবাহু, সুবল, মহাবল, মহাবাহু, স্তোককৃষ্ণ, অর্জুন, শ্রীলবঙ্গ ও উজ্জ্বল এই যে দ্বাদশ জন দ্বাদশ গোপাল নামে অভিহিত আছেন এতন্মধ্যে পঞ্চম গোপাল সুবাহুর অবতার হইলেন উদ্ধারণ দত্ত। ইনি কলিতে শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সর্বপ্রধান ভক্তরূপে ১৪০৩ শকাব্দে সপ্তগ্রামে সুবর্ণবণিক কুলে আবির্ভূত হন। এতদ্বিষয়ে মহাকবি কর্ণপুরের

'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'য় (১২৯ নং শ্লোক) উল্লেখ আছে – **"সুবাহুর্য়োব্রজে গোপা দত্ত উদ্ধারণাখ্যক"**। অর্থাৎ ব্রজের সুবাহু নামক গোপই হইলেন উদ্ধারণ দত্ত।

এই প্রসঙ্গে শ্রীমৎ প্রভু রাজবল্লভ গোস্বামী বিরচিত **"শ্রীশ্রীমুরলী বিলাস"** গ্রন্থের অষ্টম পরিচ্ছেদে উল্লেখ আছে –

"শ্রীদাম এখানে নাম অভিরাম গোপাল,
সুদাম সুন্দরানন্দ-চরিত বিশাল।
এবে ধনঞ্জয় ব্রজে বসুদাম ছিল,
পণ্ডিত শ্রীগৌরী দাস সুবল হইল।
পিপ্‌লাই কমলাকর ব্রজে মহাবল,
উদ্ধারণ দত্ত রূপে সুবাহু জন্মিল।
মহাবাহু হইলা এবে পণ্ডিত মহেশ,
দাস শ্রীপুরুষোত্তম স্তোককৃষ্ণ শেষ।
দাস শ্রীপরমেশ্বর অর্জ্জুন হইল,
কৃষ্ণদাস রূপে এবে লবঙ্গ আইল।
শ্রী মধুমঙ্গল এবে শ্রীধর ব্রাহ্মণ,
শ্রী সুবল হৈলা হলায়ুধ যশোধন।
সবে সঙ্গে লয়ে সাধিবারে জগহিত,
অবতীর্ণ হৈলা প্রেম নামের সহিত।"

এখানে উল্লেখ্য, রাজবল্লভ গোস্বামী বিরচিত মুরলী বিলাসের মত অভিরাম দাসের পাট পর্যটনেও দ্বাদশ গোপালের নাম দৃষ্ট হয়। এইভাবে অন্যান্য আরো কয়েকখানি গ্রন্থেও দেখা যায়। কিন্তু এই সমস্ত গ্রন্থোক্ত দ্বাদশ গোপালের নামের মধ্যে হুবহু মিল নাই। আর এই না থাকিবার কারণ হইল, কবি কর্ণপুর বিরচিত গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় ব্রজের গোপালের সংখ্যা দ্বাদশ নয়, পঞ্চদশ বলিয়া উল্লেখ আছে। অর্থাৎ সেখানে তিনজনের নাম বেশি আছে এবং এই বেশি থাকিবার কারণেই উল্লেখিত গ্রন্থগুলিতে দ্বাদশ গোপালের নামে গণ্ডগোল হইয়াছে। তবে প্রতিটি গ্রন্থেই যেহেতু উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের নাম আছে সেই হেতু তিনি যে দ্বাদশ গোপলেরই একজন তাহাতে সন্দেহ নাই।

যাহা হউক, দ্বাপরে ব্রজের সুবাহু নামক গোপালই যে কলিতে সপ্তগ্রামের উদ্ধারণ এই বিষয়ে অধিক আলোচনার কোনই প্রয়োজন নাই।

কারণ, উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর দেখিতে অবিকল ঠিক গোপালেরই মত অর্থাৎ তাঁহার চেহারাই নির্বাক ভাষায় বলিয়া দেয় তিনি ব্রজের সেই দ্বাদশ গোপালেরই অন্যতম এক গোপাল।

ঠাকুর উদ্ধারণ দত্ত সপ্তগ্রামে যে বংশে আবির্ভূত হন তাহা ছিল বৈশ্য জাতীয় সুবর্ণ বণিক বংশ। তাঁহার পিতার নাম শ্রীকর দত্ত এবং মাতার নাম ভদ্রাবতী দেবী। ইতিপূর্বেই বলা হইয়াছে এই উদ্ধারণ দত্ত ছিলেন নিত্যানন্দ প্রভুর নিত্যপার্ষদ। এই কারণে প্রভু নিত্যানন্দ যখনই জগতে অবতীর্ণ হন তখন উদ্ধারণ দত্তও অবতীর্ণ হইয়া থাকেন এবং একত্রে অশেষবিধ লীলাবিলাসও করিয়া থাকেন। বিশেষভাবে এই হেতুই করুণার ঠাকুর নিত্যানন্দ প্রভু তাঁহার অতি প্রিয় পার্ষদ উদ্ধারণ দত্তের সঙ্গে মিলিত হইতে সপ্তগ্রামে আসেন এবং তাঁহার গৃহে একাদিক্রমে তিনমাস অবস্থান পূর্বক অশেষবিধ লীলাবিলাস করেন। এই লীলাবিলাস সত্য সত্যই অতুলনীয়। বিষয়টি উপলব্ধি করিতে তৎকালীন সময়ের প্রত্যক্ষদর্শী প্রখ্যাত পদকর্তা বাসু ঘোষের এই উক্তিটি বিশেষভাবে উল্লেখ্য –

"বাসু বলে বৈকুণ্ঠের লীলা দত্তের ঘরে।
উদ্ধারণ ভজিলে নিতাই কৃপা করে ॥
ধ্রুব-প্রহ্লাদ সম তেহুঁ নিতাই ভজিল।
তানাকো লাগি দুন্দুভি বাজিল ॥"

প্রসঙ্গক্রমে শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর বিরচিত শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকরের (১২/৩৭৩৫-৩৭৩৭) এই উক্তিটিও সবিশেষ

প্রণিধানযোগ্য –

"উদ্ধারণ দত্তে কৃপা করি' গণসনে।
আইলেন দত্ত উদ্ধারণের ভবনে ॥
সপ্তগ্রাম বাসী শুনি' প্রভুর গমন।
চতুর্দিক ধায় লোক করিতে দর্শন ॥
উদ্ধারণ-আদি গৃহে বাঢ়ে মহানন্দ।
সবা নৃত্য কীর্ত্তনে বিহ্বল নিত্যানন্দ ॥"

তবে এখানে এই কথাটি বিশেষভাবেই উল্লেখনীয় যে, উদ্ধারণ দত্ত সপ্তগ্রামে যে সুবর্ণবণিক বংশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই বংশ তৎকালীন সময়ে একেবারেই অস্পৃশ্য, পতিত, অপাংক্তেয় বলিয়া সর্বত্র ঘোষিত ছিল। পতিতপাবন নিত্যানন্দ প্রভুর সপ্তগ্রামে শুভাগমনে এবং বিশেষভাবে উদ্ধারণ দত্তের কায়মনোপ্রাণে প্রভু নিত্যানন্দের শ্রীচরণ সেবার গুণেই সেই একেবারেই অস্পৃশ্য বণিককুল সম্পূর্ণই উদ্ধার পাইয়াছিল। উদ্ধারণ দত্ত যে অতি সযত্নে নিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীচরণ সেবা করিয়াছিলেন তাহার সত্যতা জ্ঞাত হইতে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের (১/১১/৩৮) এই একটিমাত্র উদ্ধৃতিই যথেষ্ট –

"মহাভাগবত শ্রেষ্ঠ দত্ত উদ্ধারণ।
সর্বভাবে সেবে নিত্যানন্দের চরণ ॥"

যাহা হউক, এখন তৎকালীন সময়ে সপ্তগ্রামের সুবর্ণবণিক কুল কেন যে সর্বত্র পতিত এবং অস্পৃশ্য বলিয়া ঘোষিত ছিল এবং উদ্ধারণ দত্তের নিতাই চাঁদের চন্দ্রোজ্জ্বল শ্রীচরণকমল সেবার গুণে কিভাবে উদ্ধার পাইয়াছিল সেই প্রসঙ্গের অবতারণায় আসিতেছি।

তৎকালীন সময়ে সপ্তগ্রামে শ্রীকর দত্ত নামে একজন বিশাল ধনবান বণিক বাস করিতেন। বিশাল ধনবান হইলেও তিনি ছিলেন বিশিষ্ট ভক্তপ্রাণ। এইকারণে সপ্তগ্রামের জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই তাঁহাকে অত্যন্ত প্রীতির চক্ষে দেখিতেন এবং যথোচিত সম্মানও নিবেদন করিতেন। আবার দানধ্যানেও তাঁহার এতই সুনাম ছিল যে, শোনা যায় স্বয়ং গৌড়েশ্বর তাঁহার প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে কোন রাজকীয় পদবীতে অলঙ্কৃত করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু ভক্তজনোচিত

দীনতায় অলঙ্কৃত তিনি নিজেকে সেই রাজ উপাধির নিতান্তই অনুপযুক্ত মনে করিয়া তাহা গ্রহণ করেন নাই। এই পরম ভক্তপ্রাণ শ্রীকর দত্তের সুযোগ্য পুত্রের নাম ছিল দিবাকর দত্ত। পিতার মৃত্যুর পর দিবাকর দত্ত উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত যে অঢেল বিষয় সম্পত্তি তাহা দেখাশোনা করেন। শুধু তাহাই নহে স্বীয় প্রচেষ্টা ও বুদ্ধিমত্তায় সেই বিস্তর বিষয় সম্পত্তির পরিধিকে আরও বিস্তার করেন। এই সময়ে তাঁহার অধীনে হলধর সেন নামে একজন সুবর্ণবণিক কাজ করিতেন। তিনি বিশেষভাবে শুধু জমিদারী কার্যই দেখাশোনা করিতেন। এই হলধর সেনের এত টাকা ছিল যে, লোকে তাঁহাকে হলধর কুবের বলিত। তদুপরি দিবাকর দত্তের বিশাল জমিদারী হইতেও তাঁহার প্রচুর অর্থ উপার্জন হইত এবং এই কারণে হলধর সেনের অর্থের পরিমাণ আরও বর্দ্ধিত হইয়াছিল। এই ধনকুবের হলধর সেনের ভগ্নী সুপ্রসন্নাকেই দিবাকর দত্ত বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু সুপ্রসন্না দেবী অধিকদিন দেহে ছিলেন না, একমাত্র পুত্র প্রিয়ঙ্করকে রাখিয়া অকালেই তিনি দেহরক্ষা করেন। এখানে উল্লেখনীয় যে, পরবর্তী সময়ে শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভু দিবাকর দত্তের নাম রাখেন উদ্ধারণ আর তাঁহার পুত্র প্রিয়ঙ্করের নাম রাখেন শ্রীনিবাস। এই বিষয়ে পরে আলোচনায় আসিব। এখন উল্লেখিত হলধর সেনের একমাত্র বংশপ্রদীপ গৌরীসেনের কথায় আসিতেছি।

অদ্যাপিও **"লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন"** এই যে উক্তিটি শোনা যায়, এই উক্তির মূলে হইলেন এই গৌরী সেন। তাঁহার নিকট হইতে প্রয়োজনে বঙ্গাধিপতি বল্লাল সেনও টাকা ধার লইতেন এবং পরিশোধও করিতেন। এইভাবে লেন দেন করিতে করিতে একসময়ে টাকা পরিশোধ করিতে না পারায় গৌরী সেন বল্লাল সেনকে টাকা দেওয়া সম্পূর্ণ বন্ধ করিয়া দেন। ইহাতে বল্লাল সেন গৌরী সেনের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ওঠেন এবং চক্রান্ত করিয়া একা গৌরী সেনের জন্য সমগ্র সুবর্ণবণিককুল সম্প্রদায়কেই জাতিচ্যুত করিয়া এক ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। তিনি বণিক সম্প্রদায়কে সম্পূর্ণ অচ্ছুৎ, অপাংক্তেয় প্রভৃতি বলিয়া সর্বত্র ঘোষণা করিয়া দেন। তখন হইতে সুবর্ণ বণিক সম্প্রদায় সমাজের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সম্প্রদায়ের সম্পূর্ণ বর্হিভূত হইয়া 'এক

ঘরে' হইয়া থাকেন। তাহার পর বল্লাল সেনের রাজত্ব চলিয়া যায়, বৎসরের পর বৎসর বহু বৎসরও চলিয়া যায় কিন্তু সুবর্ণ বণিক সম্প্রদায় সেই সম্পূর্ণ পতিত অবস্থাতেই থাকিয়া যায়।

এখানে উল্লেখ্য যে, উল্লেখ আছে তৎকালীন সময়ে সুবর্ণবণিক কুলে প্রায় সকলেই শুধু কামিনী কাঞ্চনাদিতেই মুগ্ধ চিত্ত ছিলেন। অর্থাৎ অধ্যাত্মজ্ঞানের আলোক তাঁহাদের মধ্যে ছিল না বলিলেই চলে এবং এই দৃষ্টিকোণ হইতেও তাঁহারা পতিত পদবাচ্যই ছিলেন।

যাহা হউক, এইভাবে বল্লাল সেন যে সুবর্ণ বণিক সম্প্রদায়কে সমাজের বুকে অতি সহজেই সম্পূর্ণ অপাংক্তেয় অর্থাৎ 'এক ঘরে' করিয়া রাখিতে পারিয়াছিলেন এই বিষয়ে একটি বিশেষ ঘটনা তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত সহায়ক হইয়াছিল। ঘটনাটি নিম্নে বর্ণিত হইতেছে।

মহারাজা বল্লাল সেনের মাতৃশ্রাদ্ধে জনৈক আমন্ত্রিত ব্যক্তি কতকগুলি সুবর্ণনির্মিত ধেনু দান করেন। সেই ধেনুগুলি সুবর্ণবণিক দ্বারা নির্মিত ছিল। ধেনুগুলির উদর ছিল আলতায় পূর্ণ। শ্রাদ্ধশেষে বল্লাল সেন তন্মধ্যে একটি একজন ব্রাহ্মণকে দান করেন। ব্রাহ্মণ আবার তাহা জনৈক সুবর্ণবণিকের নিকট বিক্রয় করেন। পরে সেই বণিক কোন কারণে ধেনুটি ছেদন করায় তাহার উদর হইতে রক্তের ধারার মত আলতা বাহির হইয়া আসে। এই দৃশ্যটি সেই ধেনুবিক্রেতা ব্রাহ্মণ ঘটনাক্রমে দেখিতে পান। তাহাতে তিনি সেইকালেই বল্লাল সেনের নিকটে যাইয়া বলেন – দেখুন মহারাজ, একজন সুবর্ণবণিকের কত বড় আস্পর্দ্ধা! আপনার মত একজন পরমদয়ালু প্রজানুরঞ্জক রাজার রাজ্যমধ্যে সে গোহত্যা করিয়াছে। ইহা শুনিয়া বল্লাল সেন সেই বণিকের উপর অত্যন্ত ক্রোধোন্মত্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার রাজ্যমধ্যে ঘোষণা করিয়াছিলেন অদ্য হইতে আমার রাজ্যমধ্যে যত সুবর্ণবণিক ও স্বর্ণকার আছে তাহাদের সকলকেই অস্পৃশ্য করা হইল। এতদ্বিষয়ে উল্লেখ আছে –

"ধেনুং স্বর্ণময়ীং যজ্ঞে দদৌ বিপ্রায় ভূপতিঃ ।
তস্যাশ্চ ধেনোশ্ছেদেন পতিতা বণিজঃ কলৌ ॥
ছিন্না বহিস্কৃতা রাজা স্বর্ণানাং বণিজঃ ক্বাচৎ ।
বিপ্রাঃ প্রতিগ্রহাজ্জাতাঃ সর্ব্বধর্ম বহিস্কৃতাঃ ॥" (কুলমার বচন)

অর্থাৎ নৃপতি স্বর্ণনির্মিত গাভী যজ্ঞে ব্রাহ্মণকে দান করিলেন, বণিকগণ তাহা ছেদন করিয়া পতিত হন। তিনি তাহাদিগকে সর্বধর্ম হইতে বহিস্কার করিলে ব্রাহ্মণগণ তাহা স্বীকার করেন।

যাহা হউক, এখন আমরা অধমতারণ পতিতপাবন নিত্যানন্দ প্রভু ত্রিবেণীর ঘাটে সপার্ষদে স্নান করিয়া একটি পাকুড় বৃক্ষের নীচে অবস্থান পূর্বক সেই যে অত্যুচ্চ কণ্ঠে হরিনাম সংকীর্তন করিতে করিতে সপ্তগ্রামের আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়া তুলিতেছিলেন সেই স্থানে ফিরিয়া আসিতেছি। তাঁহার সেই সুউচ্চকণ্ঠে নিনাদিত হরিনাম সংকীর্তনের মনমাতানো প্রাণমাতানো সুমধুর ধ্বনি নিতাই চাঁদের ইচ্ছায় তখনই তাঁহার নিত্যকালের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ পরিজন উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের শ্রবণেন্দ্রিয়ে প্রবিষ্ট হইল। আর তাহাতে তিনি অত্যন্ত উদগ্রীব হইয়া তখনই তাঁহার অনুগত অনেকানেক ভক্তবৃন্দ সহ হরিনাম সংকীর্তন করিতে করিতে ত্রিবেণীর ঘাটে লক্ষ্যস্থলে আসিয়া উপনীত হইলেন। অর্থাৎ তিনি যেন হরিনামের শোভাযাত্রাসহ তাঁহার নিত্যকালের প্রাণের প্রাণ নিত্যানন্দ প্রভুকে আবাহন করিতে আসিলেন। আসিয়া নিত্যানন্দ প্রভুর দিকে দৃষ্টি পড়িতেই সঙ্গে সঙ্গে গললগ্নকৃতবাসে তাঁহার শ্রীচরণে পড়িয়া অঝোরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাহাতে প্রভুর শ্রীচরণকমল সম্পূর্ণ বিধৌত হইয়া গেল। তবে হ্যাঁ,এই ক্রন্দন কিন্তু দুঃখের ক্রন্দন নহে, অপ্রাকৃত প্রেম নির্ঝরিত পরমানন্দের ক্রন্দন। অর্থাৎ একান্ত কাঙ্ক্ষিত প্রাণারাধ্য প্রভু নিত্যানন্দের অতুল রাতুল শ্রীচরণকমল অবলোকন করিতেই দিবাকর দত্তের হৃদ্-নদীতে পরমানন্দের যে জোয়ার উথলিয়া উঠিয়াছিল সেই ধারাই এখন তাঁহার নয়নপথে দরদর অবিরল ঝরিয়া পড়িতেছিল। আর এমতাবস্থায় প্রভু নিত্যানন্দ দিবাকর দত্তের মস্তকে হস্ত ধারণ পূর্বক প্রাণভরিয়া আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন – উঠ উঠ, আর ক্রন্দন করিও না। আজি হইতে তুমি আমার প্রিয় কিঙ্কর হইলে।

এইভাবে প্রথম দর্শনেই নিত্যানন্দ প্রভু দিবাকর দত্তকে অত্যাদরে কিঙ্কর করিয়া লইলেন এবং সেই শুভক্ষণ হইতেই শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতের (৩/৫/৪৪৯-৫০) বর্ণনায় –

"কায়বাক্য মনে নিত্যানন্দের চরণ ।
ভজিলেন অকৈতবে দত্ত উদ্ধারণ ॥
নিত্যানন্দ স্বরূপের সেবা অধিকার।
পাইলেন উদ্ধারণ কিবা ভাগ্য তার ॥"

যাহা হউক, এইভাবে ত্রিবেণীর ঘাটে ভক্ত ও ভগবানে মধুর মিলন লীলা সমাপনান্তে দিবাকর দত্ত নিত্যানন্দ প্রভুকে যুক্তকরে নম্রনত মস্তকে বলিলেন, প্রভু! আপনারা সকলে এখন এই অধমের গৃহে চলুন। মহাসৌভাগ্যে আজ আপনাদের শ্রীচরণ দর্শন করিতে পারিলাম। চলুন প্রভু, আমার গৃহে আপনি ভিক্ষা করিবেন এবং সেই ভিক্ষা প্রসাদ আমরা সবাই পাইয়া পরমানন্দ লাভ করিব।

এই কথায় নিত্যানন্দ প্রভু সম্মত হইলেন এবং মনে হয় মনে মনে স্বগতোক্তিও করিলেন – আমি তো তোমার গৃহে যাইব বলিয়াই এখানে আসিয়াছি। তোমাকে মাধ্যম করিয়াই আমি সমস্ত পতিত সুবর্ণ বণিক সম্প্রদায়কে উদ্ধার করিব।

যাহা হউক, এইভাবেই পতিতপাবন নিত্যানন্দ প্রভু সপার্ষদে সপ্তগ্রামের সুবিশাল ধনৈশ্বর্যের অধীশ্বর এবং সুবর্ণবণিক কুলের মুকুটমণি দিবাকর দত্তের গৃহে নিজ মহিমায় আশ্রয় লইলেন এবং সপার্ষদেই সেখানে ভিক্ষা গ্রহণ করিলেন। শুধু সেইদিনই নহে, সেইস্থানে অবস্থানকালীন প্রতিদিনই এবং পরবর্তী সময়েও বহুদিন সেখানে অন্ন ভোজন করিয়াছিলেন। এতদ্বিষয়ে 'প্রেমবিলাস' গ্রন্থের চতুর্বিংশ বিলাসে উল্লেখ আছে –

"স্বর্ণ বণিক উদ্ধারণ দত্ত ভক্তোত্তম।
যাহার পক্কান্ন নিতাই করেন ভক্ষণ ॥"

এই বিষয়টি যেন ভাবাই যায় না। কারণ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু হইলেন সাক্ষাৎ বলদেব। তাই তাঁহার সেবাধিকার বিশেষ ভাবে তাঁহাকে নিজহস্তে অন্নব্যঞ্জনাদি রান্না করিয়া ভোজন করাইবার মহাসৌভাগ্য লাভ করা যে ব্রহ্মা, শিবাদি দেবগণের পক্ষেও সুদুর্লভ তাহাতে সন্দেহের কোনই অবকাশ নাই। অথচ সেইদিন হইতে উদ্ধারণ দত্ত সেই সুদুর্লভ মহসৌভাগ্যলাভের অধিকারী হইয়া উঠিলেন।

এইভাবে শুধু নিত্যানন্দ প্রভুর কথাই বা বলি কেন, নীলাচলে অবস্থান কালীন শ্রীমন্ চৈতন্য মহাপ্রভুও উদ্ধারণ দত্তের তৈয়ারী অন্নব্যঞ্জন সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাতে স্বচ্ছ দিবালোকের মত স্পষ্টই প্রমাণিত হয়, ভগবদ্ভক্ত সমস্ত জাতিকুলের ঊর্দ্ধে এবং ভক্তের হাতের অন্ন চিরপবিত্র।

যাহা হউক, অতঃপর প্রভু নিত্যানন্দ অগ্রহায়ণ মাসের সপ্তমী তিথিতে দিবাকর দত্তকে **"রাধাকৃষ্ণ"** মন্ত্রে দীক্ষা দিলেন। এতদ্বিষয়ে "সুবর্ণবণিক কথা ও কীর্তি" গ্রন্থে উল্লেখ আছে –

"মার্গ শীর্ষে শুভক্ষণে সপ্তমী তিথির দিনে
তবে প্রভু বেনের কর্ণেতে।
রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র দিয়া ভাগবত শুনাইয়া
নাম কৈল অর্থের সহিতে ॥"

এইভাবে উল্লেখিত গ্রন্থেই উল্লেখ আছে, দিবাকর দত্তকে দীক্ষা দিয়াই

"প্রভু কহে হাসি হাসি বণিক কুমার।
বণিক কুল তোমা হতে হইল উদ্ধার ॥
দিবাকর কহি নাম না পুছিবে কেহ।
আজি হৈতে মোর দত্ত নাম তুমি লহ ॥
বণিক কুল উদ্ধার করিলি সে কারণ।
অজি হৈতে তোর নাম রহু উদ্ধারণ ॥"

অর্থাৎ দিবাকর দত্তকে দীক্ষা দিয়াই তাঁহাকে নিত্যানন্দ প্রভু সহাস্যে বলিলেন, তোমার দ্বারা বহুদিনের অবহেলিত ও অধঃপতিত সুবর্ণবণিক কুলের সকলেই উদ্ধার লাভ করিল বলিয়া অদ্য আমি তোমার নূতন নামকরণ করিলাম উদ্ধারণ। তুমি দেখিতে পাইবে আমার আশীর্বাদে আজি হইতে তোমাকে আর কেহ দিবাকর দত্ত বলিয়া ডাকিবে না, উদ্ধারণ দত্ত বলিয়াই ডাকিবে।

সত্য সত্যই তাহাই হইল। অর্থাৎ সেইদিন হইতে পতিতপাবনাবতার নিত্যানন্দ প্রভুর প্রাণঢালা আশীর্বাদে দিবাকর দত্ত সর্বত্রই উদ্ধারণ দত্ত নামে সুপরিচিত হইয়া উঠিলেন। আরও লক্ষণীয় নামের শেষে ধীরে ধীরে লোকমুখে 'ঠাকুর' শব্দটিও সংযুক্ত হইয়া গেল। অর্থাৎ সেই হইতে তিনি সর্বত্রই উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর নামে সুবিখ্যাত হইয়া উঠিলেন।

অত্যন্ত লক্ষণীয় বিষয় তৎকালীন সময়ে হরিদাস ঠাকুর, নরোত্তম দাস ঠাকুর, উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরাদি মুষ্টিমেয় কয়েকজনেই মাত্র "ঠাকুর" এই মহা সম্মানীয় পদবিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। ইহাতেই অনুধাবন করিতে পারা যায় উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর কত উচ্চকোটির ভক্তপ্রাণ ছিলেন।

এখানে উল্লেখ্য, পতিতপাবন নিত্যানন্দ প্রভু দিবাকর দত্তের এই যে "উদ্ধারণ" নামকরণ করিলেন ইহার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অতিগভীর। অর্থাৎ প্রভু নিত্যানন্দের শক্তিতে শক্তিমান উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের ইচ্ছা ও প্রচেষ্টায় শুধুমাত্র সপ্তগ্রামের সুবর্ণবণিক কুলেরই নহে, অন্যত্রও এত অধিক পতিতকে উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর উদ্ধার করিবেন যাহার তুলনা নাই। তাই অবশ্যই বলা যায় উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরও যে অনেকটা পতিতপাবন নিত্যানন্দ প্রভুর মতই পতিতোদ্ধারক দরদীপ্রাণ তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

প্রসঙ্গক্রমে এই কথাটি বলিতে ইচ্ছা জাগিল যে, পতিত উদ্ধারক উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের পতিতোদ্ধারণ লীলা কিন্তু তৎকালীন সময়েই সাঙ্গ হইয়া যায় নাই, অদ্যাপিও একইভাবে অব্যাহত আছে। অর্থাৎ অদ্যাপিও যাঁহারা একান্ত ভক্তিযুক্তচিত্তে উচ্চকণ্ঠে উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের নামে জয়ধ্বনি দিবেন বা তাঁহার কথাকীর্তন করিবেন সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের তো বটেই তদুপরি তাঁহার দীক্ষাগুরু নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপাশীষও তাঁহাদের উপরে শরতের শেফালী পুষ্পের মত আপনা হইতেই ঝরিয়া পড়িবে এবং তাহাতেই তাঁহাদের ত্রিতাপতরঙ্গ সঙ্কুল এই ভয়ঙ্কর ভবসাগর হইতে উদ্ধার লাভের পথ সুগম হইয়া উঠিবে। এই আলোচনায় ভক্তের নামও যে শ্রীভগবানের নামের মত মহামহিমাময় তাহা স্পষ্ট হইয়া ওঠে।

যাহা হউক, স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর অভিন্নতনু নিত্যানন্দ প্রভুর নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধারণ দত্তের মধ্যে এক অভাবনীয় পরিবর্তন দৃষ্ট হইল, তিনি উদ্দণ্ডে হরিনাম সংকীর্তন করিতে লাগিলেন এবং আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী ও অনেকানেক ভক্তপ্রাণ আনিয়া মহাসমারোহে হরির লুটের অনুষ্ঠান করিলেন। আর সেই দৃষ্টিনন্দন দৃশ্যটি দর্শন করিতেই নিত্যানন্দ প্রভু কয়েকদিন পূর্বে রঘুনাথকে কৃপা করিতে পানিহাটি গঙ্গাতীরে বটবৃক্ষমূলে যে বিশাল চিড়া দধি মহোৎসব সুসম্পন্ন করিয়া আসিয়াছেন তাহা তাঁহার মনোদর্পণে
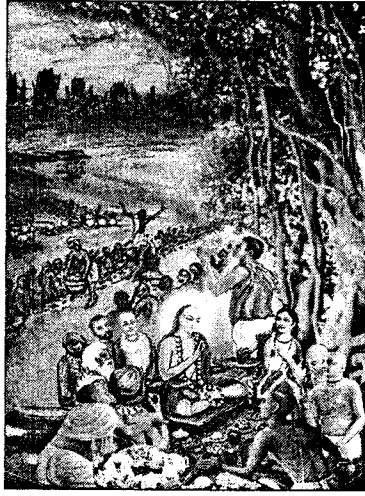
উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তাহাতে তিনি ভাবিলেন রঘুনাথের মত উদ্ধারণেরও তো অর্থের অভাব নাই। তাই উদ্ধারণকে দিয়া এখানেও পানিহাটি চিড়া দধি মহোৎসবের আদলে একটি চিড়াদধির মহোৎসব করিব এবং তাহা আজই করিব।

এই ভাবনায় তখনই তিনি উদ্ধারণ দত্তকে নিকটে ডাকিয়া সেইভাবে আদেশ দিলেন। আর–

"প্রভুর আদেশ পাইয়া দত্ত মহামতি।
চিড়াদধি ভারে ভারে লইয়া আসে তথি ॥
লকলকি কলাখণ্ড সীতা নাড়ু যোগ।
আঙ্গটিয়া কলার পাতে বাড়াইল ভোগ ॥"

এইভাবে ভোগরাগাদির পর উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর সমবেত নিমন্ত্রিত অনিমন্ত্রিত অসংখ্য জনগণের মধ্যে উদর পূর্তি চিড়াদধি প্রসাদ বিতরণ করিলেন এবং এইভাবেই দেখিতে দেখিতে ঠিক যেন পানিহাটির মত সপ্তগ্রামেও একটি বিশাল চিড়াদধি মহোৎসব সুসম্পন্ন হইয়া গেল।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর একদিকে ছিলেন যেমন বিশাল ধনবান আবার অন্যদিকে তেমন অত্যন্ত দয়ার্দ্র প্রাণও ছিলেন। তাঁহার অচিন্ত্যনীয় দয়া দাক্ষিণ্যের তুলনা জগতে অতি বিরল। দাতা হিসাবে তৎকালীন সময়ে তাঁহার নাম শুধু সপ্তগ্রামেই নহে সমগ্র বঙ্গভূমিতেই

অত্যন্ত সুবিদিত ছিল। ইহার একটি মুখ্য কারণ আমরা সুবিখ্যাত **"শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধান (৪)"** হইতে জানিতে পারি ১৪২৯ শকাব্দে বঙ্গভূমিতে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। তখন পরম উদারপ্রাণ ও মহাধনবান উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর এমনই এক সুবিশাল অন্নছত্র খুলিয়া দরিদ্র জনগণকে অকাতরে অন্ন বিতরণ করিয়াছিলেন, যাহা কিনা কল্পনাতেই আনা যায় না। কারণ সেই অন্নছত্রের জন্য চাউল ডাউল প্রভৃতি রন্ধন দ্রব্য রাখিবার ঘর এবং রন্ধনশালাই ত্রিশ বিঘা ভূমিতে সুনির্দিষ্ট ছিল। সেই ত্রিশ বিঘা জমির উপর যেখানে চাউলাদি রাখিবার গুদাম ঘরটি ছিল সেইখানেই বর্তমান ইষ্টার্ণ রেলের "আদি সপ্তগ্রাম" ষ্টেশনটি অবস্থিত।

উল্লেখিত অভিধান হইতে আরও অবগত হওয়া যায় তৎকালীন সময়ে সরস্বতী নদীর তীরে "ভদ্রবন" নামে যে একটি বিশাল জঙ্গল ছিল, উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর সেই স্থান সম্পূর্ণ পরিষ্কার করাইয়া সহস্র সহস্র দীন দুঃখীর বাসভবন নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। তৎকালীন সময়ে এই ভদ্রবনকে চলতি কথায় "ভেদোবন" বলা হইত।

এইভাবে উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের দানযজ্ঞের কথায় অকস্মাৎ মনে পড়িল এই সপ্তগ্রামে অবস্থানকালীনই তিনি নিজে উদ্যোগী হইয়া তাঁহার প্রাণারাধ্য নিত্যানন্দ প্রভুর বিবাহ দিয়াছিলেন। আর তাহাতে যে কত সজ্জন ও বৈষ্ণবপ্রাণকে তিনি নিজখরচে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইয়াছিলেন তাহার কোন সুনির্দিষ্ট সংখ্যা নাই। উল্লেখ আছে, সেই বিবাহে তিনি দশ সহস্র টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন, যাহার মূল্য বর্তমান সময়ে কল্পনাতীত।

হে প্রাণপ্রিয় পাঠকমহোদয়গণ! উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর এইভাবে যে নিজে উদ্যোগী হইয়া বহু অর্থ ব্যয়ে মহাধূমধাম সহকারে নিত্যানন্দ প্রভুর বিবাহ দিয়াছিলেন সেই বিবাহের কাহিনীটি বড়ই চমৎকার এবং বিশেষভাবে সেই বিবাহের মাধ্যমেই কৃষ্ণনাম যে মৃতসঞ্জীবনী মহামন্ত্র তাহা জগতে অত্যন্ত সুবিদিত হইয়াছে। তাই সেই ঘটনাটিও অতি সংক্ষিপ্তে এখানে একটু উল্লেখ করিবার লোভ সামলাইতে পারিলাম না।

শ্রীমন্ চৈতন্য মহাপ্রভুর আজ্ঞায় শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুকে বিবাহ করিতে হইবে এইকথা উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর ঘটনাক্রমে শ্রবণ করিতেই

তাঁহার মনোপ্রাণ পরমানন্দে নাচিয়া উঠিল। "শুভস্য শীঘ্রম্" এই ভাবনায় তিনি সেই সময়েই চারিদিকে লোকজন নিয়োগ করিয়া কোথায় যে রূপে গুণে লক্ষ্মী কন্যা আছে তাহা অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অনতিবিলম্বেই অবগত হইলেন অম্বিকা কালনায় সূর্যদাস পণ্ডিতের বসুধা ও জাহ্নবা নামে দুইটি রূপে গুণে অতুলনীয় লক্ষ্মীশ্রী কন্যা আছে।

এইভাবে সর্বসুলক্ষণা কন্যার সন্ধান পাইতেই উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর তাঁহার জীবনারাধ্য নিত্যানন্দ প্রভুর শুভ বিবাহে ঘটকের ভূমিকায় অভিনয় করিতে একান্তই তৎপর হইয়া উঠিলেন। তাই আর কালবিলম্ব না করিয়া তখনই তিনি নিত্যানন্দ প্রভুকে সূর্যদাস পণ্ডিতের কন্যাদ্বয়ের কথা বলিয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়াই কালনায় সূর্যদাস পণ্ডিতের বাসভবনে উপনীত হইলেন। নিত্যানন্দ প্রভুকে বহির্বাটিতে রাখিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ পূর্বক উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর এই বিষয়ে তাঁহার কর্তব্যকর্ম করিলেন। অর্থাৎ মধুর ভাব ও মিষ্টকথায় সূর্যদাস পণ্ডিতের নিকট তাঁহার কন্যার সাথে নিত্যানন্দ প্রভুর শুভ পরিণয়ের প্রস্তাব দিলেন। তখন পণ্ডিত পাত্রের পরিচয় জানিতে চাহিলে দত্ত ঠাকুর বলিলেন – **"পাত্র উত্তম ব্রাহ্মণ। সর্বশাস্ত্রে শ্রেষ্ঠ গরিষ্ঠ। রাঢ় চূড়ামণি। প্রেমানন্দে বাস, নাম নিত্যানন্দ।"** উত্তম ঘটক উদ্ধারণের মুখে অতি উত্তম পাত্র সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসাবাক্য শ্রবণ এবং অতঃপর অতুলনীয় সৌন্দর্যশালী প্রেমময় মূর্তি বিশিষ্ট পাত্র নিত্যানন্দ প্রভুকে স্বচক্ষে দর্শন করিয়াও সূর্যদাস পণ্ডিত তৎকালীন সময়ে সমাজে বর্ণাশ্রম ধর্মের কঠোরতার কথা ভাবিয়া উৎসাহিত হইতে পারিলেন না। তাই অন্তরে ঐকান্তিক ইচ্ছা জাগ্রত হইলেও তিনি এই প্রস্তাবটি অতি দুঃখের সাথে প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য হইলেন।

এইভাবে বড় আশা ভরা পরিণয়ের প্রস্তাবটি সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাখ্যাত হইতেই অত্যন্ত দুঃখে দত্ত ঠাকুরের প্রাণ যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু নিত্য নিয়ত নামানন্দার্ণবে নিমগ্ন নিত্যানন্দ প্রভুর আনন্দ বা নিরানন্দের কোনই হেতু নাই। কারণ তাঁহার তো আর স্বেচ্ছায় দারপরিগ্রহের আদৌ কোন ইচ্ছাই নাই। একমাত্র মহাপ্রভুর ইচ্ছাতেই তাঁহার ইচ্ছা। তাই মহাপ্রভুর যদি ইচ্ছা না হয় এখানে বিবাহ হইবে না। তাহাতে আর নূতন ভাবনার কি থাকিতে পারে ? কিন্তু দত্ত ঠাকুরের সত্য

সত্যিই দুঃখের আর অবধি থাকিল না। এমতাবস্থায় অতীব বেদনাহত তিনি নিত্যানন্দ প্রভুকে বলিলেন – প্রভু! সূর্যদাস পণ্ডিতের কন্যার মত এমন সুলক্ষণা ভক্তিমতী কন্যারত্ন সারা ভারতবর্ষে আর কোথাও মিলিবে না। তাই তাঁহার কন্যার সাথে আপনার বিবাহ হইলে আমরা সকলেই যারপরনাই আনন্দিত হইব, এমনকি মহাপ্রভুও ইহাতে অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিবেন। তাই আমাদের এবং বিশেষভাবে মহাপ্রভুকে প্রীত করিতে আপনাকে বলিতেছি এই বিবাহই যাহাতে সুসম্পন্ন হয় আপনি সেই সুব্যবস্থা করুন, প্রয়োজনে এখন আপনি একটু ঐশ্বর্য প্রকাশ করুন।

একান্ত অনুগত ভক্ত উদ্ধারণ দত্তের এই কথায় নিত্যানন্দ প্রভুর মুখমণ্ডলে একটি মৃদু হাসির রেখা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কারণ সর্বজ্ঞ তিনি বিশেষভাবেই জানিতেন যে, এই বিবাহই তাঁহাকে করিতে হইবে। কারণ একমাত্র নিজ কান্তা ব্যতিরেকে অপর কাহারও সহিত তাঁহার বিবাহ হইতে পারে না। ইহার কারণ ভগবৎ লীলায় স্বরূপ বিরোধী কোন কার্যই সম্ভব নহে। এই কারণে অভিন্ন বলরাম নিত্যানন্দের নিত্য কান্তা বারুণী এবং রেবতী ইতিপূর্বেই সূর্যদাস পণ্ডিতের দুইকন্যা বসুধা এবং জাহ্নবা রূপে আবির্ভূত হইয়া আছেন। তাই এই বিবাহই তাঁহাকে করিতে হইবে। তথাপিও তিনি অতি প্রিয় ভক্ত ও শিষ্য উদ্ধারণের অনুরোধ রক্ষা করিতে আর সেইসাথে কৃষ্ণনাম যে মৃতসঞ্জীবনী মহামন্ত্র তাহা জগতে প্রকাশ করিতে একটু ঐশ্বর্য প্রকাশ করিতেই আগ্রহী হইয়া উঠিলেন।

ইতিমধ্যেই একদিন নিত্যানন্দ প্রভু আর তাঁহার প্রাণপ্রিয় শিষ্য উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর দুইজনে কালনা গঙ্গাতীরে শ্মশানঘাটে বসিয়া কৃষ্ণকথা আলাপ আলোচনা করিতেছিলেন। আর এদিকে অকস্মাৎ অপস্মার রোগে মতান্তরে বিষধর সর্পাঘাতে সূর্যদাস পণ্ডিতের প্রথমা কন্যা বসুধার প্রাণবিয়োগ হওয়ায় শোকাহত সূর্যদাস কন্যার মৃতদেহ দাহ করিতে লোকজন সহ শ্মশান ঘাটে আসিয়াছেন। দূর হইতে এই দৃশ্য দেখিয়াই সর্বজ্ঞ নিত্যানন্দ প্রভু উদ্ধারণ দত্তকে বলিলেন–দেখি তোমার বাসনা এখন মিটাইতে পারি কিনা। এই বলিয়া তিনি সূর্যদাসের সমীপবর্তী হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, দেখুন এখনও যদি আপনি আপনার কন্যা বসুধার সাথে আমার বিবাহ দিতে সম্মত হন তাহা হইলে বসুধা অবশ্যই প্রাণ ফিরিয়া পাইবে।

এই কথায় অত্যন্ত অভিভূত হইয়া সূর্যদাস সম্মত হইলেন এবং অবাক বিস্ময়ে সতৃষ্ণ দৃষ্টি মেলিয়া নিত্যানন্দ প্রভুর দিকে তাকাইয়া থাকিলেন। আর নিত্যানন্দ প্রভু তৎক্ষণাৎ মৃত বসুধার নিকটবর্তী হইয়া তাঁহার কর্ণকুহরে অত্যুচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করিতে লাগিলেন-

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥"

এই কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের অপ্রাকৃত শব্দ তরঙ্গের ঝঙ্কারে সঙ্গে সঙ্গে বসুধার মৃতদেহে প্রাণের সঞ্চার হইল এবং তখনই তিনি নিদ্রোত্থিতের মত উঠিয়াও বসিলেন।

এই কল্পনাতীত অতি অলৌকিক দৃশ্যটি দর্শন করিতেই দত্ত ঠাকুরের আনন্দের আর সীমা পরিসীমা থাকিল না। তিনি অনতিবিলম্বেই শুভ দিনক্ষণ দেখিয়া মহাধূমধাম সহকারে বসুধার সহিত নিত্যানন্দ প্রভুর বিবাহ দিলেন। সূর্যদাস পণ্ডিত অত্যধিক আনন্দাতিশয্যে বিবাহের যৌতুক রূপে জাহ্নবাকেও নিত্যানন্দের শ্রীকরে সম্প্রদান করিলেন। এই বিষয়ে প্রেমবিলাসে (চতুর্বিংশ বিলাস) উল্লেখ আছে –

"বসুধারে গ্রহণ কৈলা বিধি অনুসারে।
যৌতুকে নিলেন প্রভু কনিষ্ঠা জাহ্নবারে ॥"

এতদ্বিষয়ে নিত্যানন্দ বংশবিস্তরেও বর্ণিত হইয়াছে–

"ইহা দেখি নিত্যানন্দ করে আকর্ষিয়া।
বসাইল জাহ্নবারে দক্ষিণে আনিয়া ॥
সূর্যদাস পণ্ডিতেরে কহিল এই কথা।
যৌতুকে লইলাম তোমার কনিষ্ঠ দুহিতা ॥"

যাহা হউক, ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে বিপুল বিত্তশালী ও উদার হৃদয় উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরই এই বিবাহের সমস্ত ব্যয়ভার সানন্দে বহন করিয়াছিলেন। এই বিবাহের মাধ্যমে যুগপৎ দত্ত ঠাকুরের মনের বাসনা এবং কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র যে মৃতসঞ্জীবনী মহামন্ত্র তাহা জগতের বুকে প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণিত হইল। এখানে এই কথাটিও উল্লেখনীয় যে, লোকশিক্ষা নিমিত্ত নিত্যানন্দ প্রভু এতদৃশ অলৌকিক আচরণের মাধ্যমে সকলকে আকৃষ্ট করিয়া একমাত্র তাঁহার মত উচ্চকোটির নামপ্রেমিকের

শ্রীমুখোদ্গীর্ণ কৃষ্ণনামেই যে পুনর্জীবন পাওয়া সম্ভব তাহাও জগজ্জীবকে জানাইয়া গিয়াছেন।

আসুরিক তাণ্ডব হইতে জগৎকে রক্ষা করিবার জন্য শ্রীভগবান বিভিন্ন রূপে বিভিন্নভাবে জগতে আবির্ভূত হন। কলির প্রথম অন্ধকারে আলোক সঞ্চার করিতে তাই দ্বাপরের স্বয়ং বলরাম নিত্যানন্দ রূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়া সহজ মানুষের মত সাধারণ মানুষের কাছে প্রকাশিত হইয়াছিলেন এবং মাদৃশ কলিপীড়িত অসংখ্য সংসারী মানুষকে কিভাবে সংসার করিতে হয়, সেই সুদুর্লভ কৃষ্ণের সংসার গড়িয়া তুলিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। ধন্য ধন্য প্রভু তোমার অপার মহিমা! ধন্য তোমার দার পরিগ্রহ রূপ অমিয় লীলা কথা।

যাহা হউক, উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের জনহিতকর কার্যাবলীও অত্যন্ত প্রশংসনীয়। কারণ এক সময়ে তিনি বনোয়ারীবাদের জমিদারের দেওয়ান হিসাবে (মতান্তরে নবহট্টের নৈ-নামক রাজার দেওয়ান) যখন কার্য করিতেন, তখনসেই কার্যের সুবাদে সেখানেই তিনি বাস করিতেন। সেইকালে বিশাল ধনশালী দত্ত ঠাকুর শুধু মাত্র জনকল্যাণোদ্দেশ্যেই নবাব হুসেন শাহের নিকট হইতে সেই জমিদারী ক্রয় করিয়া লইয়াছিলেন। পরবর্তী সময়ে উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের নামানুসারেই সেই স্থানটির "উদ্ধারণপুর" নামকরণ করা হইয়াছিল এবং স্থানটি সেই নামেই অদ্যাপিও সুপরিচিত হইয়া আছে। তৎকালীন সময়ে সেই স্থানের জনগণের সুবিধার্থে তিনি গঙ্গাতীরে যে একটি সুবৃহৎ ঘাট নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন তাহা অদ্যাপিও বিরাজমান থাকিয়া দত্ত ঠাকুরের জনহিতকর কার্যাবলীর এক অত্যুজ্জ্বল সাক্ষ্য বহন করিয়া চলিয়াছে। সেই ঘাটটির প্রথম ধাপে উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের একটি মূর্তিও বিদ্যমান রহিয়াছে।

পরমভক্ত উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর তাঁহার অঢেল অর্থ যে দীন-দুঃখী, দেব-দ্বিজ এবং বৈষ্ণব সেবাদিতে অকাতরে ব্যয় করিতেন তাহার অজস্র প্রমাণ পাওয়া যায়। আর এইভাবে শুধুমাত্র অন্ন-বস্ত্র-অর্থাদি দিয়াই যে তিনি মানুষের উপকার করিতেন তাহা নহে, একনিষ্ঠ হরিনামানুরক্ত প্রাণ দত্ত ঠাকুর প্রাণপণ প্রচেষ্টায় হরিনাম সংকীর্তন প্রচারের মাধ্যমে মানুষের সর্বদুঃখের মূলাধার যে অবিদ্যার ঘোরান্ধকার তাহা অপসারিত করিয়া

সেখানে তিনি বিশুদ্ধ প্রেমের আলো জ্বালাইতেন। উল্লেখ আছে, মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভুর নির্দেশে তিনি গৌড় দেশের কালনা, কাটোয়া প্রভৃতি অনেকানেক স্থানেই হরিনাম প্রচার করেন। আবার পরমারাধ্য নিত্যানন্দ প্রভুর সহিত দাক্ষিণাত্য ও অন্যান্য অনেকানেক স্থান পরিভ্রমণ কালেও যে তিনি হরিনাম প্রচার করিয়াছেন তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এক কথায় বলা যায় – উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের সম্পূর্ণ জীবনটাই ছিল মানুষের ঐহিক ও পারলৌকিক এই উভয়বিধ উপকারের জন্যই সর্বতোভাবে উৎসর্গীকৃত। অর্থাৎ তিনি ছিলেন শ্রীশ্রী চৈতন্যচরিতামৃতে(১/৯/৩৯) উল্লেখিত শ্রীমন্ চৈতন্য মহাপ্রভুর এই সুমহান উপদেশটির একটি প্রকট মূর্তি –

"ভারত ভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি কর পরোপকার ॥"

এই উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর একদিকে যেমন ছিলেন উচ্চকোটির ভক্তপ্রাণ আবার অন্য দিকে তেমন ছিলেন গভীর জ্ঞানবান। উল্লেখ আছে তিনি ছিলেন তৎকালীন সময়ে টোলে উত্তীর্ণ একজন সম্মানীয় বিশাল পণ্ডিত। অঢেল অর্থ ব্যয়ে তিনি যে গীতা ভাগবতাদি অনেকানেক ধর্মগ্রন্থ সংগ্রহ পূর্বক নিত্য নিয়মিত একায়ন চিত্তে অধ্যয়ন করিতে করিতে অবশেষে অগাধ জ্ঞানের এক বিশাল ভাণ্ডার সদৃশ হইয়া উঠিয়াছিলেন তাহা তাঁহার দিব্য জীবনী পাঠে সহজেই জানা যায়। আবার নিত্যানন্দ প্রভু তাঁহার গৃহে অবস্থান কালে তাঁহার মুখে নিত্যদিনই অধ্যাত্মজ্ঞানোপদেশ শ্রবণ করিয়া তিনি তাঁহার সেই অগাধ জ্ঞান ভাণ্ডারকে যে আরও পুষ্ট করিয়া তুলিয়াছিলেন তাহাও জানা যায়। কিন্তু অত্যন্ত লক্ষণীয় বিষয় তাঁহার লেখা কোন গ্রন্থ বা পদাবলী কিছুই পাওয়া যায় না। অর্থাৎ তিনি কোন গ্রন্থাদি প্রণয়ন করেন নাই। কিভাবে করিবেন ? কারণ, শাস্ত্র অপেক্ষা শ্রীভগবানের নামেই ছিল তাঁহার তন্ময়তার আধিক্য। এই প্রসঙ্গে বৈষ্ণব চূড়ামণি রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর কথাটিও বিশেষভাবে মনে পড়ে। ইহার কারণ তাঁহারও সর্বশাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য থাকা সত্ত্বেও তিনি কোন গ্রন্থ রচনা করিতে পারেন নাই। ইহার কারণ, গভীর নিষ্ঠায় শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা এবং নিত্যনিয়ত শ্রীভগবানের নাম গ্রহণ করায় অশ্রু পুলকাদি প্রেমের

লক্ষণগুলি তাঁহার দিব্যদেহে সদাসর্বদাই স্ফুরিত হইত। এমতাবস্থায় হয়ত তিনি গ্রন্থ রচনার সময় দিতে পারেন নাই।

যাহা হউক, দত্ত ঠাকুর যে বিশেষ শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন তাহা সর্বজ্ঞ নিত্যানন্দ প্রভু বিশেষভাবেই জ্ঞাত ছিলেন। এই কারণে তিনি সপ্তগ্রামে দত্ত ঠাকুরের গৃহে অবস্থান কালে একদিন দত্ত ঠাকুরকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন – আচ্ছা উদ্ধারণ, তুমি কি স্কন্দপুরাণ অধ্যয়ন করিয়াছ ? এই কথায় দত্ত ঠাকুর "না প্রভু" বলায় নিত্যানন্দ প্রভু বলিলেন – তবে শোন, স্কন্দপুরাণে স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে –

"হরিনামাক্ষরং ভুক্ত ভালে গোপীমৃদাঙ্কিতম্ ।
তুলসী তিলকোরস্কং ন স্পৃশের্য্যমোদভটা ঃ ॥"

প্রাণের ঠাকুর নিত্যানন্দ প্রভুর এই ইঙ্গিত পূর্ণ কথায় অত্যন্ত অনুপ্রাণিত হইয়া সেই দিন হইতে দত্ত ঠাকুর এবং তাঁহার অনুরোধে সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়ের সকলেই লজ্জা ঘৃণা ভয় সম্পূর্ণ জলাঞ্জলি দিয়া মালা তিলক ধারণ করিতে লাগিলেন। শুধু তাহাই নহে, বৈষ্ণববেশে সজ্জিত হইতেই দেখা গেল হরিনামেও তাঁহারা অধিকতর অনুরাগী ও উৎসাহী হইয়া উঠিলেন। আর তাহা অবলোকনে নিত্যানন্দ প্রভু অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলেন এবং সেই আনন্দের আতিশয্যে তিনি তাঁহার প্রিয় কীর্তনীয়া ষষ্ঠীবরকে ডাকিয়া উদ্ধারণের গৃহে হরিনাম সংকীর্তনের হাট বসাইলেন। এই বিষয়ে উল্লেখ আছে –

"ষষ্ঠীবর গায় আর উদ্ধারণ নাচে।
নিতাই চাঁন্দে হেন ভক্তি কোথা কার আছে ॥"

এইভাবে হরিনাম সংকীর্তনের বিশেষ মূর্তিমন্ত বিগ্রহ পতিতপাবন নিত্যানন্দ প্রভুর একান্ত প্রযত্নে উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের গৃহে হরিনামের বন্যা বহিতে লাগিল। ক্রমে সেই বন্যার গতি শতমুখে প্রধাবিত হইয়া সমগ্র সপ্তগ্রামের প্রতিটি ঘরে ঘরে গ্রামে গামে অলিতে গলিতে সর্বত্রই ছড়াইয়া পড়িল। বন্যায় যেমন খালবিল খানাখন্দ নদীনালা সমস্তই ভাসিয়া একাকার হইয়া যায়, কোন একটি স্থানই আর বাকী থাকে না, সপ্তগ্রামে নিতাই চাঁদের প্রবর্তিত হরিনামের বন্যাতেও ঠিক তদ্রূপ অবস্থাই হইল। অর্থাৎ সেই হরিনামের বন্যায় সপ্তগ্রামের মূর্খ জ্ঞানী, ধনী দরিদ্র, ধার্মিক

অধার্মিক, পাপী পুণ্যবান, হিন্দু মুসলমান, অধমপতিত সকলেই প্রেমানন্দে ভাসিতে লাগিল, কেহই আর বাকী থাকিল না। কিন্তু এমনই দুর্দৈব যে, বর্ণশ্রেষ্ঠ একজন ব্রাহ্মণ সেই বন্যায় তো ভাসিলেনই না বরং এই বিষয়টি তিনি কিছুতেই মানিয়া লইতেও পারিলেন না। তদুপরি বিদ্বেষের দুর্বিসহ জ্বালাযন্ত্রণায় তাঁহার গাত্রদাহ হইতে লাগিল। আর তাহাতে অত্যন্ত অতিষ্ঠ হইয়া একদিন তিনি নিত্যানন্দ প্রভুকে অপদস্থ করিবার দুরভিসন্ধি লইয়া সাত সকালেই উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের গৃহে আসিয়া উপনীত হইলেন এবং জ্ঞান শ্রেষ্ঠ না ভক্তি শ্রেষ্ঠ এই বিষয় লইয়া নিত্যানন্দ প্রভুর সহিত তর্কযুদ্ধ শুরু করিয়া দিলেন। নিত্যানন্দ প্রভুর একান্ত ইচ্ছায় সেই তর্কযুদ্ধাবসানে মীমাংসায় পৌঁছাইতে অনেক বিলম্ব হইয়া গেল। সেই ইচ্ছাটি কি তাহা পাঠকগণ ঘটনাক্রমে একটু পরেই স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন। এখন হে পাঠক পাঠিকাগণ আপনারা এই মহাসত্য ঘটনাটি একটু মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করুন। তর্কযুদ্ধে অনেক বিলম্ব যখন হইয়া গেল তখন নিত্যানন্দ প্রভু ইঙ্গিতে উদ্ধারণ দত্তকে বলিলেন, এই ব্রাহ্মণ যেন তোমার গৃহ হইতে অভুক্ত ফিরিয়া না যান। তখন দত্ত ঠাকুর সেই অতিথি ব্রাহ্মণকে সবিনয়ে বলিলেন – দেখুন মধ্যাহ্ন সময় উপস্থিত হইয়াছে, তাই এখন কৃপাপূর্বক আপনি সরস্বতীর জলে স্নান করিয়া আমার গৃহেই অন্নগ্রহণ করুন। দত্ত ঠাকুরের প্রাণজুড়ানো বিনয় বাক্য আর নিত্যনন্দ প্রভুর একান্ত ইচ্ছায় ব্রাহ্মণ ভোজনে সম্মত হইলেন।

অতঃপর ব্রাহ্মণ সরস্বতীতে স্নান করিতে গেলেন আর এই অবসরে উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর নিত্যানন্দ প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন – প্রভু! আজ আমি কি রান্না করিব আর ঐ অতিথি ব্রাহ্মণকেই বা কি ভোজন করাইব? এই কথায় নিত্যানন্দ প্রভু বলিলেন – উদ্ধারণ, এখনতো সময় খুবই সংক্ষেপ তাই তুমি অতি সত্ত্বর ডালে চালে খিচুড়ি রান্নারই ব্যবস্থা কর।

অতঃপর নিত্যানন্দ প্রভুর ইচ্ছামতই রান্নার ব্যবস্থা হইল এবং রান্নাশেষে উদ্ধারণ ঠাকুর স্বহস্তে গৃহাঙ্গনে সারিবদ্ধভাবে বসিবার আসন ও ভোজনের পাতা পর পর সাজাইয়া দিলেন। দেখা গেল পতিতপাবন নিত্যানন্দ প্রভু পরমানন্দে ভক্তদের লইয়া সেই পঙ্ক্তিভোজনেই বসিয়া পড়িলেন। আর এদিকে স্নানান্তে ব্রাহ্মণও আসিয়া অঙ্গনে দণ্ডায়মান

হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই নিত্যানন্দ প্রভু আসুন আসুন বলিয়া তাঁহাদের সাথে একই পঙ্‌ক্তিতে বসিয়া ভোজন করিতে অনুরোধ করিলেন। তাহাতে ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন – রান্না করিয়াছে কে ?

এই প্রশ্নে নিত্যানন্দ প্রভু উদ্ধারণের নাম উচ্চারণ করায় ব্রাহ্মণ তেলেবেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন আর অত্যধিক ক্রোধে তাঁহার চক্ষুদ্বয় জবাফুলের মত রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলিয়া উঠিলেন – বেনের হাতের রান্না আমি কিভাবে ভোজন করিব ? আমি কি আজ জাতিকুল সমস্তই নষ্ট করিব নাকি ? গ্রন্থের ভাষায় –

"বানিয়ার পাচিত অন্ন কেমনে খাইব।
দিনে দিনে এমতে কি জাতি খণ্ডাইব ॥"

এই কথায় নিত্যানন্দ প্রভু বলিলেন – গুণ ও কর্মানুযায়ীই তো জাতিত্বের সৃষ্টি। গীতা (৪/১৩) ও ভাগবতে (৭/১১/৩৫) সেই কথাই বলা হইয়াছে। তাই উদ্ধারণের মত উচ্চকোটির ভক্তের রান্নায় কোনই দোষ হয় না। আর বিশেষভাবে উদ্ধারণতো গোবিন্দের প্রসাদ রান্না করিয়াছে। গোবিন্দের প্রসাদ পাইতে কাহার না ইচ্ছা হয় ? আমি তো তাহা পরমানন্দের সহিত ভোজন করি। গোবিন্দের প্রসাদ কখন কোন অবস্থাতেই অপবিত্র বা উচ্ছিষ্ট হয় না। তাই আপনি কোন প্রকার দ্বিধা দ্বন্দ্ব না করিয়া ভক্তিভাবেই এখানে ভোজন করুন।

এখানে উল্লেখ্য, শুধুমাত্র সপ্তগ্রামে উদ্ধারণ দত্তের গৃহেতেই নহে, উদ্ধারণ দত্তকে সঙ্গে লইয়া নিত্যানন্দ প্রভু যখন নানাস্থানে নাম প্রচার করিতেন তখনও তিনি দত্ত ঠাকুরের শ্রীহস্তের রান্না ভোজন করিতেন। এই বিষয়ে "নিত্যানন্দ বংশ বিস্তার" গ্রন্থে স্পষ্ট উল্লেখ আছে –

"একদিন বিপ্রসব একত্র হইয়া।
হাস পরিহাস রূপে প্রভুকে সুধায়া ॥
শ্রীপাদের নিতি নিতি ভিক্ষা আয়োজন।
স্বপাক করয়ে কিম্বা আছয়ে ব্রাহ্মণ ॥
প্রভু বলে কখন বা আমি পাক করি।
না পারিলে উদ্ধারণ রাখয়ে উতারি ॥
এই মত পরিবর্ত রূপে পাক হয়।

শুনিয়া সবার মনে হইল বিস্ময় ॥
তারা কহে এ বৈষ্ণব হয় কোন জাতি।
পূর্ব্বাশ্রমে কোন্ নাম কোথায় বসতি ॥
প্রভু কহে ত্রিবেণীতে বসতি উহার।
সুবর্ণবণিক দেখি করিনু স্বীকার ॥
এত শুনি সব বিপ্র হাসিতে লাগিল।
ঈশ্বরের স্বেচ্ছাময় আচার জানিল ॥”

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, নিত্যানন্দ প্রভুর ভোজন এবং আচার আচরণ ছিল অত্যন্ত উদার, যাহা সাধারণের বুদ্ধির অগম্য। তাঁহার এই ভোজন প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ড ঊনবিংশ পরিচ্ছেদের একটি ঘটনা মনে পড়িল। একদিন অদ্বৈতগৃহে মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ প্রভু এবং হরিদাস ঠাকুর ভোজন করিতেছিলেন। ভোজন শেষ হইবার একটু পূর্বে নিত্যানন্দ প্রভুর মধ্যে অকস্মাৎ বালকোচিত ভাবের প্রকাশ ঘটিল। দেখা গেল তিনি সারা ঘরে অন্ন ছিটাইয়া শিশুর মত হাসিতেছেন। তাহা দেখিয়া হরিদাস ঠাকুরও হাসিতে লাগিলেন আর মহাপ্রভু শুধু 'হায় হায়' করিতে লাগিলেন। কিন্তু অদ্বৈত প্রভু যেন খুব ক্রুদ্ধ হইয়াছেন এতাদৃশ ভাব প্রকাশ করিয়া হরিদাস ঠাকুরকে বলিলেন—দেখ হরিদাস!

“জাতি নাশ করিলেক এই নিত্যানন্দ।
কোথা হৈতে আসি হৈল মদ্যপের সঙ্গ ॥
গুরু নাহি, বোলয় সন্ন্যাসী করি নাম।
জন্ম বা না জানিয়ে নিশ্চয় কোন গ্রাম ॥
কেহো ত না চিনে নাহি জানে কোন জাতি।
ঢুলিয়া ঢুলিয়া বুলে যেন মাতা-হাথী ॥
ঘরে ঘরে পশ্চিমার খাইয়াছে ভাত।
এখন আসিয়া হৈল ব্রাহ্মণের সাথ ॥
নিত্যানন্দ-মদ্যপে করিব সর্বনাশ।
সত্য সত্য সত্য এই শুন হরিদাস ॥”

—শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত (২/১৯/২৪৫-২৪৯)

অর্থাৎ অদ্বৈত প্রভু বলিলেন – এই নিত্যানন্দ আমার ঘরে এইভাবে উচ্ছিষ্টান্ন ছড়াইয়া আমার জাতি নষ্ট করিয়াছে। বিষয়টি জানিতে পারিলে গোটা ব্রাহ্মণ সমাজই তো আমাকে পরিত্যাগ করিবে। কোথা হইতে এই মদ্যপ আসিয়া আমার সঙ্গ করিল ? এই নিত্যানন্দের গুরুও নাই অথচ নিজেকে সন্ন্যাসী বলিয়া সর্বত্র প্রচার করে। ইহার জন্ম সম্বন্ধেও কিছু জানি না, কোথায় কোন্ গ্রামে যে ইহার জন্ম হইয়াছে তাহাও জানি না। অজ্ঞাতপরিচয় ইহার সাথে এক ঘরে বসিয়া ভোজন করা আমার পক্ষে সঙ্গত নয়। মত্ত হস্তীর মত ঢুলিয়া ঢুলিয়া সর্বত্র বেড়ায়। নিত্যানন্দ পশ্চিম দেশীয় আচার ভ্রষ্ট লোকদিগের ঘরে ঘরে যাইয়া তাহাদের ভাত খাইয়াছে। সে আচার ভ্রষ্ট এবং ব্রাহ্মণ সমাজে সম্পূর্ণ অচল। অথচ নবদ্বীপে আসিয়া কি ভাবে যেন ব্রাহ্মণদের সঙ্গ করিতেছে। জান হরিদাস, একা সে সমস্ত ব্রাহ্মণকে আচার ভ্রষ্ট করিয়া সকলের জাতিকুল নষ্ট করিয়া সর্বনাশ করিবে এবং সবাইকে নিজের মত মদ্যপ করিয়া ফেলিবে।

এই কথাগুলি হইল নিত্যানন্দ প্রভুর প্রতি অদ্বৈত প্রভুর আপাত নিন্দাসূচক কিন্তু গভীর প্রেমপূর্ণ উক্তি। এই কথাগুলির মর্মার্থ অতি গূঢ় ও গভীর। অর্থাৎ অদ্বৈতপ্রভু আসলে বলিতেছেন, শ্রীনিত্যানন্দ তাঁহার পরমপবিত্র এবং পরমপাবন ভুক্তাবশেষ ছড়াইয়া আমাকে জানাইলেন যে, শ্রীকৃষ্ণে নিবেদিতান্ন এবং কোন ব্যক্তি কর্তৃক ভুক্ত সেই নিবেদিতান্ন কখনও অপবিত্র নহে এবং এই অন্নকে জাত্যভিমান বশতঃ আমি অদ্যাবধি যাহা সাধারণ অন্নের মত মনে করিতাম নিত্যানন্দ প্রভু অতি সহজ ভাবে তাহা জানাইয়া আমার জাত্যভিমান দূরীভূত করিয়াছেন।

আবার নিত্যানন্দের গুরু নাই অথচ নিজেকে সন্ন্যাসী বলিয়া প্রচার করেন, জন্মস্থান বা জন্মের বিবরণও অজ্ঞাত এই কথার মাধ্যমে অদ্বৈত প্রভু বলিলেন নিত্যানন্দ প্রভু হইলেন বলরাম, স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় কলেবর। অর্থাৎ ঈশ্বরতত্ত্ব হওয়ায় তিনি জগদ্‌গুরু সেইহেতু তাঁহার কোন গুরু নাই বা থাকিতেও পারে না। একই ভাবে তাঁহার সন্ন্যাস গ্রহণেরও কোন প্রয়োজন নাই। মহাপ্রভুর সাথে জগতে অবতীর্ণ হইয়া শুধুমাত্র লোকশিক্ষার্থেই তিনি সন্ন্যাস-আশ্রম অবলম্বন করিয়াছেন। আর এই ভাবেই শ্রীনিত্যানন্দ ঈশ্বর তত্ত্ব বলিয়া তিনি অনাদি, নিত্য ও অজ।

অতএব যাঁহার জন্ম নাই তাঁহার জন্মের বিবরণ, জন্মস্থানের নামের কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। প্রকট লীলায় একচক্রায় যে জন্ম তাহা হইতেছে আবির্ভাব মাত্র। জীবের জন্মের মত তাঁহার কোন জন্ম নাই।

আবার নিত্যানন্দ মত্ত হস্তীর মত যে ঢুলিয়া ঢুলিয়া বেড়ান এই কথার অর্থ হইল কৃষ্ণপ্রেমরূপ মদিরা পানে মত্ত হইয়া মত্ত হস্তীর মতই তিনি সর্বত্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ান।

এইভাবে নিত্যানন্দ প্রভু যে ঘরে ঘরে পশ্চিমা ভাত ভোজনান্তে এখন ব্রাহ্মণের সাথে মিলিত হইয়াছেন এই কথার অন্তর্নিহিত অর্থ হইল ব্রজ, মথুরা এবং দ্বারকা এই তিনটি শ্রীকৃষ্ণ ধামই নবদ্বীপের পশ্চিমদিকে। বলরাম রূপে ইনি দ্বাপরে যখন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তখন যতদিন ব্রজে বাস করিয়াছেন ততদিন শ্রীকৃষ্ণগত প্রাণ ব্রজ পরিকরগণের ঘরে ঘরেই তিনি গিয়াছেন এবং তাঁহাদের অন্নও তিনি শ্রীকৃষ্ণের সাথে ভোজন করিয়াছেন। আবার যখন তিনি মথুরা এবং পরে দ্বারকায় গিয়াছিলেন তখনও তিনি একইভাবে মথুরা ও দ্বারকাবাসীদের অন্ন ভক্ষণ করিয়াছেন। এখন সেই তিনিই আবার নবদ্বীপে আসিয়া ব্রাহ্মণদের সাথে মিশিয়া তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করিতেছেন। অর্থাৎ ইহাতে শ্রীনিত্যানন্দের অপার করুণার মহিমাই প্রকাশ পাইয়াছে।

আবার নিত্যানন্দ যে সকলকে আচার ভ্রষ্ট ও জাতিকুল নষ্ট করিয়া এবং সকলকেই নিজের মত মদ্যপ করিয়া ফেলিবেন এই কথার তাৎপর্য ইহাই যে, কৃষ্ণপ্রেমরূপ মদিরা পানোন্মত্ত নিত্যানন্দ সকলের জাত্যভিমানাদি সর্ববিধ অভিমান দূরীভূত করিয়া দিবেন এবং সকলকেই তিনি কৃষ্ণপ্রেম-মদিরা পান করাইয়া দুর্লভ মনুষ্যজন্ম সম্পূর্ণ সার্থক করাইবেন।

এইভাবেই অদ্বৈত প্রভু সশ্রদ্ধচিত্তে কৃত্রিম ক্রোধের ভিতর দিয়া সেইদিন নিত্যানন্দতত্ত্বের নিগূঢ় দিকটি অনেকটাই ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, এই ক্রোধের অন্তরালে রহিয়াছে নিত্যানন্দ প্রভুর প্রতি অদ্বৈতপ্রভুর গভীর শ্রদ্ধা ভক্তি ও প্রেমের অভিব্যক্তি।

যাহা হউক, উদ্ধারণ দত্তের গৃহে নিত্যানন্দ প্রভুর ভোজন প্রসঙ্গে এতগুলি কথা আলোচিত হইল। এখন আবার আগের প্রসঙ্গেই ফিরিয়া আসিতেছি।

অধমতারণ পতিতপাবন নিত্যানন্দ প্রভু উদ্ধারণ দত্তের গৃহে ভোজন করিবার জন্য সেই তার্কিক ব্রাহ্মণকে অনেকানেক যথোচিত যুক্তিযুক্ত কথা বলিয়া বুঝাইলে তিনি উদ্ধারণ দত্তের হস্তের রান্না ভোজন করিতে সম্মত হইলেন এবং নিত্যানন্দ প্রভুর সাদর আহ্বানে তাঁহার পার্শ্বের আসনেই বসিলেন। আর তখনই দত্ত ঠাকুর তাঁহার নিজের হাতে রান্না খিচুড়ী প্রসাদ নিজেই পরিবেশন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহা দেখিয়াই ব্রাহ্মণ তৎক্ষণাৎ সক্রোধে বলিয়া উঠিলেন–একি! এখন যে দেখিতেছি উদ্ধারণ নিজের হাতেই পরিবেশন করিতে শুরু করিয়াছে। তাহার হাতের রান্না না হয় ভোজন করিলাম কিন্তু সকলের সম্মুখে প্রকাশ্যে সাক্ষাৎ ভাবে বেনের হাতের ছোঁয়া অন্ন আমি কিভাবে ভোজন করিব ? অসম্ভব।

এই কথা বলিয়াই সেই ব্রাহ্মণ অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হইয়া আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তদ্দর্শনে পার্শ্বস্থ নিত্যানন্দ প্রভু পুনর্বার তাঁহাকে যথোচিত শাস্ত্রযুক্তি সহ কত কথা বলিয়া বুঝাইলেন। কিন্তু এইবারে আর কোন কথাই কাজে লাগিল না। বরং উদ্ধারণের দিকে সক্রোধে তাকাইয়া বলিয়া উঠিলেন–তোমার এতদূর স্পর্দ্ধা যে, তুমি নিজের হাতেই পরিবেশন করিতে শুরু করিয়াছ ? তোমার ছোঁয়া অন্ন খায় কে ?

অত্যন্ত ক্ষিপ্ত ব্রাহ্মণের মুখে এই ক্রোধোক্তি শ্রবণ করিয়াই শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভু উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং উচ্চকণ্ঠে উদ্ধারণকে বলিলেন–উদ্ধারণ, তোমার হাঁড়ির ঐ যে কাষ্ঠের হাতাটি আমার হাতে দাওতো দেখি!

এখানে উল্লেখ্য তৎকালীন সময়ে রান্নায় খুন্তি ব্যবহার হইত না। গাছের ডাল হইতে প্রস্তুত খুন্তি দ্বারা রান্নাদি করা হইত।

যাহা হউক, নিত্যানন্দ প্রভুর আজ্ঞা পাইয়াই উদ্ধারণ দত্ত কাষ্ঠের হাতাটি নিত্যানন্দ প্রভুর হস্তে দিলেন। দেখা গেল প্রভু হাতাটি লইয়াই সমবেত সকলের সমক্ষে উদ্ধারণের অঙ্গনে পুঁতিয়া দিলেন। আর কি আশ্চর্য! সঙ্গে সঙ্গে চক্ষের পলকে তাহা হইতে পত্র পুষ্পে সুশোভিত একটি বৃহদাকার মাধবীতরু উদ্ভুত হইল। শুধু তাহাই নহে, তাহাতে অগণন মৌমাছি বসিয়া মধুপান করিতে লাগিল। গ্রন্থের ভাষায়–
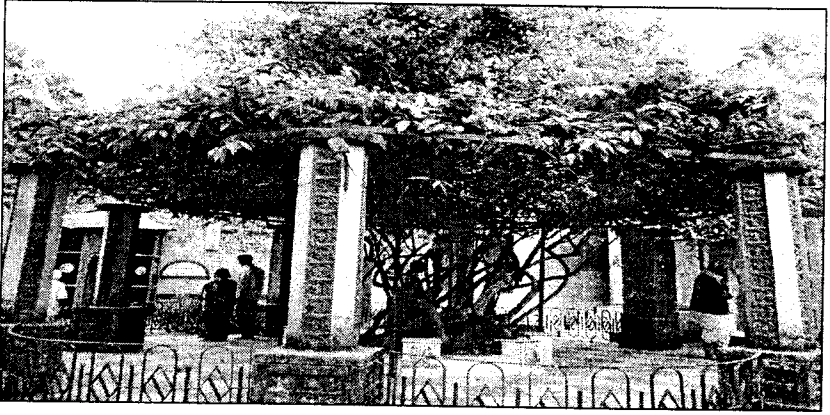
"মুহূর্তের মধ্যে হল বৃক্ষের উন্নতি।
পুষ্পিত হইল মধু, পিয়ে অলিকুল ততি ॥"

এইভাবে ১৪৩৮ শকাব্দে গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে কাঠফাটা রৌদ্রের মধ্যে এই মাধবীলতা বৃক্ষটি সৃষ্টি হওয়ায় সমবেত সকলের মনে হইল যেন শ্রীমন্ নিত্যানন্দ মহাপ্রভু প্রখর রৌদ্র নিবারণের জন্য অনেকানেক শাখা প্রশাখায় একটি আতপত্র তৈয়ারী করিলেন, যাহার তলে বসিয়া ভক্তগণ প্রসাদ গ্রহণ ও হরিনাম সংকীর্তন করিতে পারিবেন। সমবেত সকলেই নিত্যানন্দ প্রভুর অলৌকিক ক্ষমতা, উদ্ধারণ দত্তের ভক্তির উৎকর্ষতা ও তাঁহার স্পর্শের পবিত্রতা অনুধাবন করিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন। তাহাতে সেই জাত্যভিমানী ব্রাহ্মণও ব্যতিক্রম হইল না। তিনি বেশ কিছুক্ষণ বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে বিমূঢ়ের মত একদৃষ্টে সেই অতি অলৌকিক সৃষ্ট মাধবীলতার দিকে তাকাইয়া থাকিলেন। অতঃপর আচ্ছন্নভাব কাটিয়া যাইতেই তিনি মাধবীতলায় আসিয়া মাধবীতরুকে সভক্তিচিত্তে প্রণতি নিবেদন করিলেন। তাহাতে তাঁহার মধ্যে এক অভাবনীয় পরিবর্তন দেখা দিল। তিনি উদ্ধারণের উঠানের মাটি সর্বাঙ্গে মাখিয়া হরিবোল বলিতে বলিতে উদ্দণ্ডে নৃত্য করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে ক্রন্দন বিজড়িত কণ্ঠে উদ্ধারণকে বলিলেন, উদ্ধারণ! দাও তোমার হাতের রান্না তুমিই আমাকে দাও। আজ শুধু উদরের ক্ষুধা নয়, ত্রিতাপক্লিষ্ট জীবনের ক্ষুধাও মিটাইয়া লই।

এখানে উল্লেখ্য, এইভাবে শুধুমাত্র সেই ব্রাহ্মণেরই নহে, জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে তৎকালীন সময় হইতে সেই মাধবীলতাটি অগণিত ত্রিতাপ জর্জরিত কলিক্লিষ্ট জীবের জীবনের জ্বালা মিটাইয়া আসিতেছেন। কারণ এই বৃক্ষ বা লতা তো সাধারণ বস্তু নয়, ইহা পতিতপাবন প্রেমদাতা নিতাই চাঁদের করুণাসৃষ্ট বৃক্ষরূপী মাধবীলতা। তদুপরি উল্লেখ্য, এই বৃক্ষের অত্যলৌকিক বিকাশের পর পরই প্রেমাবতার মহাপ্রভু এখানে শুভাগমন করেন এবং তাঁহারই অভিন্ন তনু নিত্যানন্দ সৃষ্ট এই মাধবীলতা বৃক্ষটি অবলোকনে উদ্ধারণকে পরমাদরে ডাক দিয়া বলেন, উদ্ধারণ, তোমাকে কৃপা করিতেই নিতাই চাঁদ এই মাধবীলতাটি সৃজন করিয়াছেন। তাই তুমি এই মাধবীলতার আশ্রয়ে থাকিয়া হরিনাম করিবে, দেখিবে তাহাতেই তুমি প্রাণে শান্তি পাইবে। শুধু তুমি নও, যাঁহারাই মনে প্রাণে এই মাধবীলতা মণ্ডপে আশ্রয় লইবেন ও প্রণাম করিবেন তাঁহারাও নিতাই চাঁদের করুণায় পরম শান্তি ও পরমানন্দ লাভ করিবেন।

যাহা হউক, এই মাধবীলতার উৎপত্তি বিষয়ে মতান্তরও পরিলক্ষিত হয়। মতান্তরে নিত্যানন্দ প্রভু নহেন, উদ্ধারণ দত্তের মহিমা জগতকে জানাইবার নিমিত্ত নিত্যানন্দ প্রভু তখন উদ্ধারণ দত্তকেই কাষ্ঠহাতাটি তাঁহার অঙ্গনে পুঁতিয়া দিতে আজ্ঞা করেন এবং সেই আজ্ঞা প্রতিপালিত হইতেই এই মাধবীলতার উৎপত্তি। অর্থাৎ ভক্ত যে জাতিবর্ণের বহুউর্দ্ধে এই কথা জগৎকে চাক্ষুষ দেখাইতেই উদ্ধারণ দত্তের মধ্যে শক্তিসঞ্চার করাইয়া তাঁহার মাধ্যমে নিত্যানন্দ প্রভু মাধবীলতাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

এই প্রসঙ্গে একটু বিশদভাবেই বলিতে ইচ্ছা জাগে যে, উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের দিব্যজীবন সত্য সত্যই নিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীচরণে উৎসর্গীকৃত হইয়া পূর্ণিমা চন্দ্রের অপেক্ষাও অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল। অর্থাৎ নিতাই চাঁদই ছিলেন তাঁহার জীবনের একমাত্র ধ্যান জ্ঞান ও সর্বস্ব ধন। স্মরণে, মননে, অনুভবে একমাত্র নিতাই চাঁদ ব্যতিরেকে তিনি আর অন্য কিছু জানিতেন না। তাই দত্ত ঠাকুরের অচিন্ত্যনীয় ভক্তিমহিমার কথা শ্রবণেই যে কলিহত জীবের মহাপাপরাশি দূরীভূত করাইয়া বিশুদ্ধ প্রেমভক্তি লাভ করাইবে তাহাতে কোনই সন্দেহের অবকাশ নাই। এই নিমিত্তই মনে হয় নিত্যানন্দ প্রভু উদ্ধারণ ঠাকুরের হৃদয়স্থ ভক্তির প্রকটমূর্তিরূপ এই

মাধবীলতাটি সৃজন করাইয়াছিলেন। অর্থাৎ পতিতপাবন নিত্যানন্দ প্রভুর উদ্দেশ্য ইহাই যে, দত্ত ঠাকুরের ভক্তির প্রকটরূপ এই মাধবীলতার দর্শন, স্পর্শন, প্রণতি নিবেদন এবং তাঁহার কথাচিন্তন ও শ্রবণাদিতেই কলিহত জীব প্রেমভক্তি লাভে ধন্য হইবে।

এখানে উল্লেখনীয়, কাষ্ঠ হাতা হইতে মাধবীলতাটি নিত্যানন্দ প্রভুই সৃষ্টি করুন অথবা তাঁহার শক্তিতে শক্তিমান উদ্ধারণই সৃষ্টি করুন ইহাতে ব্যাপার কিন্তু একই। ইহাতে বিতর্কের কোন স্থান নাই। কারণ নিত্যানন্দ প্রভু নিজেই করুন অথবা দত্ত ঠাকুরকে শক্তি সঞ্চার করাইয়া করুন মূল সেই শক্তি নিত্যানন্দ প্রভুরই।

যাহা হউক, ডাউল রন্ধনের শুষ্ক কাষ্ঠ হাতা হইতে ইচ্ছাময় নিত্যানন্দ প্রভুর ইচ্ছাশক্তি এবং তাঁহার কৃপাধন্য উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের বিশুদ্ধ ভক্তির একত্র সম্মিলনে সৃষ্ট এই বৃক্ষটি যে জগৎকল্যাণে একটি **"অপ্রাকৃত কল্পতরু"** তাহাতে কোনই মতানৈক্য নাই বা থাকিতেও পারে না। কারণ বৃক্ষটি দর্শন করিবার সঙ্গে সঙ্গে যুগপৎ নিতাই চাঁদ এবং উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের শ্রীমূর্তি নয়নপথে ভাসিয়া ওঠে। অতএব এই অপ্রাকৃত কল্পতরুকে তাঁহাদের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি জ্ঞানে পরমভক্তিযুক্তচিত্তে প্রণতি নিবেদন পূর্বক যিনি যাহা প্রার্থনা করিবেন তাঁহার সেই মনোবাসনা অবশ্যই পূরণ হইবে। তবে এখানে আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন মাধবীলতাকে সভক্তিচিত্তে প্রণতি নিবেদন পূর্বক তাঁহার নিকটে জাগতিক কোন বস্তু প্রার্থনা না করিয়া দুর্লভ মনুষ্যজন্মের সর্বোপরি প্রয়োজন যে ব্রজপ্রেম তাহাই শুধু প্রার্থনার প্রয়োজন।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (১/৩/২০) উল্লেখ আছে, একমাত্র স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত দ্বিতীয় অপর কেহ ব্রজপ্রেম দান করিতে পারেন না। সুতরাং এই মাধবীলতা তাহা কিভাবে দান করিবেন?

এই প্রশ্নোত্তরে বলা যায় শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভু হইলেন স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই অবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর অভিন্ন তনু এবং তাঁহারই অচিন্ত্য কৃপাশক্তির ঘনীভূত মূর্তি এই মাধবীলতা। অতএব এই লতাকে স্মরণ প্রণামে অবশ্যই ব্রজপ্রেম লাভ সম্ভব।

অতঃপর বলা যায় সপ্তগ্রামের সেই মাধবীলতার সন্নিধানে গেলে সেইস্থানের সিদ্ধমৃত্তিকার স্পর্শ লাভে প্রেমের ঠাকুর মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভু সহ মহাপ্রেমিক দত্ত ঠাকুর, নরোত্তম দাস ঠাকুরাদি বিশ্ববরেণ্য বৈষ্ণব সাধকদিগের অসামান্য সাধনশক্তির মহাবীজ অলক্ষিত ভাবেই আমাদের হৃদয়ভূমিতে প্রবিষ্ট হইবে এবং সেই শক্তির অঙ্কুরোদ্গমে আমরাও আশা করিতে পারি অবশ্যই একদিন ব্রজপ্রেম লাভে দুর্লভ মনুষ্যজন্মকে সার্থক করিয়া তুলিতে পারিব।

ভাষান্তরে বলা যায়, যে কোন তীর্থস্থান মাত্রেই স্বয়ং ভগবান অথবা তাঁহার অবতার অথবা কোন না কোন উচ্চকোটির সাধকপুরুষের লীলাভূমি। এই কারণে, যে কোন তীর্থক্ষেত্রেই তাঁহাদিগের নিজ নিজ অসামান্য সাধনশক্তির প্রভাব বিদ্যমান থাকে এবং এই কারণেই তীর্থস্থানগুলি পাপনাশক, পুণ্যসঞ্চারক এবং সেই সাথে প্রেমভক্তিলাভেরও উদ্দীপক হইয়া থাকে। অর্থাৎ শ্রদ্ধাবান ভক্তগণ তীর্থক্ষেত্রে যাইবামাত্রই তাঁহাদের মধ্যে সেইস্থানের সাধকপুরুষদিগের সাধনোচিত শক্তি অবশ্যই ফুটিয়া উঠিবে।

এই যথোচিত যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্তে অবশ্যই বলা যায় পুরাকালের সপ্তঋষি, বর্তমান কালের সপার্ষদ মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভু এবং উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরাদি উচ্চাঙ্গের মহাপ্রেমবান ভক্তদিগের বিচরণ ক্ষেত্র সপ্তগ্রাম একটি মহাতীর্থক্ষেত্র এবং বিশেষভাবে মাধবীলতার তলদেশটুকু মহা মহা তীর্থক্ষেত্র। এই কারণেই সেই স্থানের ধূলিতে লুটাইলে অথবা সেইধূলি মস্তকে ধারণ করিলে স্বাভাবিকভাবেই প্রেমভক্তি লাভ হইবে।

তাই পরমপ্রিয় পাঠকবৃন্দের উদ্দেশ্যে বলি – দেখুন, মনুষ্য জীবন দুর্লভ হইলেও অনিত্য। এমনই অনিত্য যে, তাহা ঠিক পদ্মপত্রে জলবিন্দুর মতই টলটলায়মান। অর্থাৎ এই আছে পরক্ষণেই নাই। তাই সংসারের শত অসুবিধা বা প্রতিবন্ধকতাদি সমস্ত উপেক্ষা করিয়া যতশীঘ্র সম্ভব তৎকালীন সময়ের সপ্তগ্রামেরই বর্তমান নামান্তর আদি সপ্তগ্রামে উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের শ্রীপাটে গমন করিয়া তৎপ্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ ও মাধবীলতাটি দর্শন করিয়া দুর্লভ মনুষ্যজীবনকে সার্থক করিয়া তুলুন। আর প্রেমাশ্রুবিগলিত নয়নে মধুর কণ্ঠে গাহিয়া উঠুন–

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥"

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, সপ্তগ্রাম আসিবার অব্যহিত পূর্বে নিত্যানন্দ প্রভু বর্তমান সময়ে আদ্যাপীঠের অনতিদূর আড়িয়াদহে গদাধর দাসের গৃহে কয়েকদিন অবস্থান করিয়া সেখানেও তিনি ঘটনাক্রমে রান্নার একখানি

কাষ্ঠহাতা মৃত্তিকাতে প্রোথিত করায় তাহা হইত সঙ্গে সঙ্গে অতি অলৌকিকভাবে একটি সুবৃহৎ মালতীলতার সৃষ্টি হইয়াছিল এবং তাহার তলদেশে কীর্তনীয়া মাধব ঘোষের মুখে দানখণ্ডলীলাটি কীর্তিত হইয়াছিল। অদ্যাপিও সেখানে অনেকখানি জায়গা জুড়িয়া অনেকানেক ভক্তবৃন্দের প্রাণ জুড়াইবার মনোরম স্থানরূপে সেই মালতীলতাটি বিজমান রহিয়াছে। মনে হয় যেন মালতীলতাটি নিত্যানন্দ প্রভুর অলৌকিক কীর্তি এবং তাঁহার পুণ্যস্মৃতি বহন করিয়া চলিয়াছে। সেই মালতীলতা জননীর তলদেশরূপ স্নেহময় অঙ্কে কিছুদিন পূর্বে আমার একদিন কিছুক্ষণ অবস্থানের সৌভাগ্য হইয়াছিল।

যাহা হউক, এখন আমরা পুনরায় পূর্বের সেই আলোচনায় ফিরিয়া আসিতেছি। অর্থাৎ সপ্তগ্রামে আসিয়া নিত্যানন্দ প্রভু সেই যে নামপ্রেমের প্রবল বন্যা বহাইয়াছিলেন সেই কথায় ফিরিয়া আসিতেছি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, ইতিপূর্বে মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে প্রেমানন্দের বন্যায় সমগ্র নদীয়ার যে অবস্থা হইয়াছিল অর্থাৎ **"শান্তিপুর ডুবুডুবু ন'দে ভেসে যায়"** এখন সপ্তগ্রামেও সেই অবস্থার পুনরাবৃত্তি ঘটিল। এই উক্তি যে একটুও অত্যুক্তি নহে তাহা স্বয়ং ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস বিরচিত

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতে (৩/৫/৪৫৩-৪৬৭) বর্ণিত এই অংশটুকুতেই পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায়।

"বণিক তারিতে নিত্যানন্দ অবতার।
বণিকেরে দিলা প্রেম-ভক্তি অধিকার ॥
সপ্তগ্রামে প্রতি-বণিকের ঘরে ঘরে।
আপনে শ্রী নিত্যানন্দ কীর্ত্তন বিহরে ॥
বণিক্ সকল নিত্যানন্দের চরণ।
সর্ব্বভাবে ভজিলেন লইয়া শরণ ॥
বণিক্সভের কৃষ্ণভজন দেখিতে।
মনে চমৎকার পায় সকল জগতে ॥
নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর মহিমা অপার।
বণিক্ অধম মূর্খ যে কৈল উদ্ধার ॥
সপ্তগ্রামে মহাপ্রভু নিত্যানন্দ রায়।
গণ-সহ সঙ্কীর্তন করেন লীলায় ॥
সপ্তগ্রামে যত হইল কীর্তন বিহার।
শত বৎসরেও তাহা নারি বর্ণিবার ॥
পূর্বে যেন সুখ হৈল নদীয়া নগরে।
সেই মত সুখ হৈল সপ্তগ্রাম পুরে ॥
রাত্রি দিনে ক্ষুধাতৃষ্ণা নাহি নিদ্রা ভয়।
সর্ব্বদিগ্ হৈল হরি সংকীর্তন ময় ॥
প্রতি-ঘরে ঘরে প্রতি-নগরে-চত্বরে।
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু কীর্তন-বিহরে ॥
নিত্যানন্দ স্বরূপের আবেশ দেখিতে।
হেন নাহি যে বিহ্বল না হয় জগতে ॥
অন্যের কি দায় বিষ্ণুদ্রোহী যে যবন।
তাহারাও পাদপদ্মে লইল শরণ ॥
যবনের নয়নে দেখিতে প্রেমধার।
ব্রাহ্মণের আপনারে জন্মায় ধিক্কার ॥

জয় জয় অবধূত চন্দ্র মহাশয়।
যাহার কৃপায় হেন সব রঙ্গ হয় ॥
এই মতে সপ্তগ্রামে, আম্বুয়া-মুলুকে।
বিহরেন নিত্যানন্দ স্বরূপ কৌতুকে ॥"

এই বিস্তৃত বিবৃতিকে ভিত্তি করিয়া অবশ্যই বলা যায় তৎকালীন সময়ে সপ্তগ্রামে প্রেমদাতা পতিতপাবন শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভু চির অনর্পিত প্রেমধন জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে প্রচার ও প্রদানের মাধ্যমে পতিতোদ্ধারণ লীলার যে এক অভিনব ও অচিন্ত্যনীয় অদ্ভুত দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া গিয়াছেন তাহার তুলনা শুধু নবদ্বীপ বা নদীয়াই নহে, সমগ্র বঙ্গভূমি তথা ভারতভূমিতেও আর দ্বিতীয় কোথাও নাই। আর তাই এই ঘটনার কিছুদিন পরে নিত্যানন্দ প্রভু যখন নীলাচলে গিয়াছিলেন তখন একদিন মহাপ্রভু তাঁহাকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন,

"নীচ জাতি পতিত অধম যতজন।
তোমা হইতে এবে সবার মোচন ॥
যে ভক্তি দিয়াছ তুমি বণিক সবারে।
তাহা বাঞ্ছে সুর সিদ্ধ মুনি যোগেশ্বরে ॥

অর্থাৎ জগৎপ্রাণ মহাপ্রভু তখন নিত্যানন্দ প্রভুকে বলিলেন – জগতের যত নীচ জাতি আর অধম পতিত প্রাণ ছিল তাহাদের সবাইকেই তুমি উদ্ধার করিলে। বিশেষভাবে উদ্ধারণ দত্ত প্রভৃতি সপ্তগ্রামের সুবর্ণবণিকগণকে তুমি যে প্রেমভক্তি দান করিয়াছ তাহা দেবমুনি ঋষি যোগী সকলেই মনেপ্রাণে কামনা করেন।

অতএব স্বয়ং ভগবান শ্রীমন্ চৈতন্য মহাপ্রভুর এই মুখোক্তি মত অবশ্যই বলা যায় তৎকালীন সময়ে শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভু সুবর্ণবণিককুলকে উদ্ধার করিয়া সপ্তগ্রামকে একটি মহাতীর্থস্থানেই পরিণত করিয়া গিয়াছেন, যাহার মহিমা অদ্যাপিও সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণই রহিয়াছে। অর্থাৎ অদ্যাপিও সপ্তগ্রামের অলিতে গলিতে গ্রামে গ্রামে পথে পথে ব্রহ্মা শিবাদি দেবগণ এবং নারদাদি মুনিঋষিগণ বাঞ্ছিত সপার্ষদ নিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীচরণ ধূলি মিশিয়া আছে। আর তাই স্থান মাহাত্ম্যে সপ্তগ্রাম অদ্যাপিও যে অবশ্যই প্রেমভক্তি লাভের একান্ত সহায়ক একটি পীঠভূমি তাহাতে কোনই সন্দেহের

অবকাশ নাই। বিশেষভাবে তৎকালীন সময়ে উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের শ্রীহস্তে সেবিত ও প্রতিষ্ঠিত শ্রীমন্ চৈতন্য মহাপ্রভুর ষড়ভুজ মূর্তি অদ্যাপিও

সেখানে সগৌরবে বিদ্যমান। মহাপ্রভুর দক্ষিণে নিত্যানন্দ প্রভু এবং বামে গদাধর শোভা পাইতেছেন। সেই সাথে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ, শালগ্রাম শিলা এবং শ্রীশ্রী উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের চিত্রপটও শোভা পাইতেছেন। শ্রীমন্দিরের সম্মুখেই সুদৃশ্য নাটমন্দির এবং তাহার সম্মুখে নিত্যানন্দ প্রভুর অত্যলৌকিক সৃষ্ট সেই সমগ্র অধ্যাত্ম জগদ্বিখ্যাত মাধবীলতা মণ্ডপটি, যাহা এখন অসংখ্য শাখা প্রশাখায় বিস্তৃত হইয়া আছে। ইহা হইতে অধিক বিস্তৃত হইয়া আছে তাঁহার দিগ্‌দিগন্ত বিস্তৃত জগন্মঙ্গল মহিমা, যে মহিমার সুস্নিগ্ধ আলোকে সমগ্র অধ্যাত্মজগতই আজ আলোকিত।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য সেই মাধবীলতা মণ্ডপটির পার্শ্বেই উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের সমাধি বিদ্যমান, যাহা দর্শনে মনে হয় মাধবীলতা মা যেন দত্ত
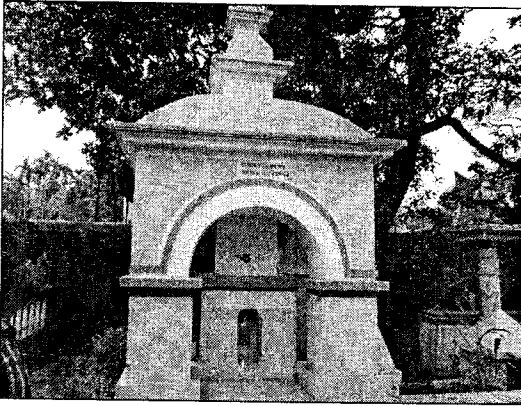
ঠাকুরকে নিজ সন্তানের মত সস্নেহে নিজপার্শ্বে আবরিয়া রাখিয়াছেন।

প্রসঙ্গক্রমে আরও উল্লেখ্য যে, শ্রীপাটের অদূরে একটি পুষ্করিণীও বিদ্যমান, যাহার সম্পর্কে উল্লেখ আছে উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের গৃহে অবস্থানকালে একদিন নিত্যানন্দ প্রভু দত্ত ঠাকুরকে লইয়া ঐ পুষ্করিণীটিতে সন্তরণ

করিতেছিলেন আর সেই সময় অকস্মাৎ প্রভুর পদকমলের নূপুর খসিয়া পড়ে। কিন্তু উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের ঐকান্তিক ইচ্ছায় নিত্যানন্দ প্রভুর সেই নূপুর আর উদ্ধারের চেষ্টা করা হয় নাই। তৎকালীন সময় হইতে অদ্যাবধি সেই পুষ্করিণীটি **"নূপুর কুণ্ড"** নামে বিখ্যাত হইয়া আছে বা ভবিষ্যতেও অবশ্যই থাকিবে বলিয়া ভাবিতে পারি। ভক্তগণের নিকটে এই কুণ্ডের জল শ্রীধাম বৃন্দাবনের রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ডের জলের মতই মহাপবিত্র, যাহার বিন্দুমাত্র সভক্তিচিত্তে মস্তকে ধারণে অবশ্যই প্রেমভক্তির উদয় হইয়া থাকে।

প্রতিবৎসর অগ্রহায়ণী কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথিতে উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের তিরোভাব তিথিকে চন্দ্রসূর্যের মত চির উজ্জ্বল রাখিতে শ্রীপাটে বহুদূর দূরান্ত হইতে সমাগত অসংখ্য ভক্তপ্রাণ মিলিত হইয়া থাকেন। প্রসঙ্গক্রমে আরও উল্লেখনীয় যে, এই সপ্তগ্রাম সপার্ষদ নিত্যানন্দ প্রভুর তো বটেই, তদুপরি ভক্তশ্রেষ্ঠ কালিদাস, বলরাম আচার্য, বৈষ্ণবকুলমুকুটমণি শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী, স্বয়ং নামাচার্য শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুর প্রমুখ উচ্চকোটির শ্রীচৈতন্যানুচরদিগেরও পদধূলিধন্য মহাপবিত্র স্থান। এই সমস্ত কারণে সপ্তগ্রামের মহিমা সম্পর্কে সুবিখ্যাত ভক্তিগ্রন্থ শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকরে(৮/১৪৫) উল্লেখ আছে–

"সপ্তগ্রাম দর্শনে সকল দুঃখ হরে।
যথা প্রভু নিত্যানন্দ আনন্দে বিহারে ॥"

উল্লেখিত শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকরেই অত্যন্ত লক্ষণীয় বিষয়, নিত্যানন্দ প্রভুর আবেশ অবতার নরোত্তম দাস ঠাকুর যখন এই মহাতীর্থ সপ্তগ্রাম দর্শনে আসিয়াছিলেন। তখন –

"সপ্তগ্রাম দেখি' প্রণময়ে দূর হইতে ॥"

অর্থাৎ দূর হইতে সপ্তগ্রাম দর্শন করিতেই নরোত্তম দাস ঠাকুর প্রণতি নিবেদন করেন। অতঃপর সপ্তগ্রামের মধ্যে উদ্ধারণ দত্তালয়ে আসিয়াই মহপ্রেমে মাতোয়ারা হওয়ায় তিনি যেভাবে অবিরল ধারায় প্রেমাশ্রুতে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন তাহা উল্লেখিত শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থেরই অষ্টম তরঙ্গে অনেকখানি জায়গা জুড়িয়া অতি সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ আছে। অর্থাৎ তৎকালীন সময়ে নিত্যানন্দ প্রভুর আবেশ অবতার নরোত্তম দাস ঠাকুর কলিহত প্রতিটি জীবকে যেন নিজ আচরণের মাধ্যমে চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন সপ্তগ্রামে আসিয়া নিত্যানন্দ প্রভু এবং উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের দিব্যলীলাস্থলী দর্শনে দুর্লভ প্রেমভক্তিলাভে আশু সহায়ক হইয়া থাকে।

যাহা হউক, এখন সপ্তগ্রাম অবস্থানকালে উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর কেন যে মহাপ্রভুর দ্বিভুজ মূর্তির পরিবর্তে ষড়ভুজ মূর্তি প্রতিষ্ঠা পূর্বক সেবার্চনা করিতেন এতদ্বিষয়েও কয়েকটি কথা আলোচনা করিতে ইচ্ছা করিতেছি।

এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে মনে পড়ে প্রথম অবস্থায় ভক্তিবিরোধী মায়াবাদী মহাপণ্ডিত সার্বভৌম ভট্টাচার্যের কথা। ঘটনাক্রমে পরবর্তী অবস্থায় তিনি যখন মহাপ্রভুর কৃপায় মহাপ্রভুর স্বরূপতত্ত্ব বুঝিতে পারিলেন তখন তাহা চাক্ষুষ দর্শনের জন্য তাঁহার মনে একান্ত অভিলাষ জাগিল। আর ঠিক তখনই মহাপ্রভু–

"দেখাইল আগে তারে চতুর্ভুজ রূপ।
পাছে শ্যাম বংশীমুখ-স্বকীয় স্বরূপ ॥"

–শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (২/৬/১৮৩)

অর্থাৎ মহাপ্রভু সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে সর্বাগ্রে নিজের ঐশ্বর্যাত্মক চতুর্ভুজ রূপ দেখাইলেন। আবার স্বয়ং ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণই যে গৌরাঙ্গ

রূপে প্রকটিত হইয়াছেন, ইহা জানাইবার জন্যই পরে নিজের দ্বিভুজ-মুরলীধর মধুর রূপ দেখাইলেন।

এই দৃশ্য দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে সার্বভৌম ভট্টাচার্যের পাণ্ডিত্যের অহংকার সম্পূর্ণ দূরীভূত হইয়া গেল। কারণ তিনি মনে প্রাণে মর্মে মর্মে বুঝিতে পারিলেন মহাপ্রভুই সেই স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। ইহা বুঝিয়াই তিনি প্রভুর চরণে দণ্ডবৎ হইয়া পড়িয়া গেলেন এবং চিরদিনের জন্যই মহাপ্রভুর শ্রীচরণে বিকাইয়া গেলেন।

এখানে উল্লেখ্য, এতদিন পাণ্ডিত্যের গর্ব রূপ মলিনতায় সার্বভৌম ভট্টাচার্যের চিত্ত আচ্ছন্ন ছিল বলিয়া তিনি মহাপ্রভুর সাক্ষাতে থাকিয়াও তাঁহার তত্ত্ব বুঝিতে পারেন নাই। এখন মহাপ্রভুর করুণায় এই রূপ অবলোকনে তাঁহার গর্বাদি সমস্তই অন্তর্হিত হওয়ায় মহাপ্রভুই যে স্বয়ং ভগবান তাহা বিশেষভাবে বুঝিতে পারিলেন। আর এই জন্যই আমার মনে হয় উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর যে মহাপ্রভুর সেই ষড়ভুজ মূর্তি প্রতিষ্ঠাপূর্বক পূজার্চনা শুরু করেন ইহাতে মুখ্য উদ্দেশ্য ইহাই যে, সেই মূর্তি দর্শনে লোকে বিশেষভাবে বুঝুক বা জানুক মহাপ্রভু সর্বৈশ্বর্যপূর্ণ স্বয়ং ভগবান এবং তাহা বুঝিলে বা জানিলেই তাহারা মহাপ্রভুর প্রবর্তিত মহানামে অনুপ্রাণিত হইয়া অবশ্যই তাঁহার কৃপালাভ করিতে পারিবে।

প্রসঙ্গক্রমে আরও উল্লেখ্য পাপীতাপী দুষ্কৃতিকারীকে বিনাশ এবং সাধুসজ্জন ভক্তপ্রাণকে রক্ষা করিতে শ্রীভগবান যুগে যুগে বিভিন্ন রূপে এই ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। মহাপ্রভুর এইভাবে ষড়ভুজ মূর্তিতে প্রকাশার্থে আমরা বুঝিতে পারি বংশীবদন রূপে শ্রীভগবানের মাধুর্যমণ্ডিত রূপ, মহাপ্রভু রূপে তাঁহার চিরবদান্য কৃষ্ণপ্রেমোজ্জ্বল রাধাকান্তরূপ এবং রামরূপে দুষ্কৃতি বিনাশক রূপ অর্থাৎ একই সাথে মাধুর্য, বদান্য ও বিনাশক মূর্তিতে শ্রীভগবানের রূপ বুঝিতে পারি। আর তাই উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর তাঁহার পূজিত ষড়ভুজ মূর্তির মধ্যে এই তিনের প্রকাশ দেখাইয়া মহাপ্রভুই যে স্বয়ং ভগবান তাহা জগজ্জীবের কাছে প্রকাশ করিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ্য, সপ্তগ্রামের মত উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের অপর এক লীলাস্থলী বর্দ্ধমান জেলায় কাটোয়ার নিকটে উদ্ধারণপুরে। এখানেও তাঁহার একটি শ্রীপাট আছে এবং এখানেও তিনি মহাপ্রভুর মূর্তি

পতিষ্ঠাপূর্বক সেবার্চনা করিয়া গিয়াছেন। তবে এখানে কিন্তু শ্রীমূর্তি ষড়ভুজ নয়, দ্বিভুজ। উদ্ধারণপুরের নিকটে বনোয়ারীবাদ রাজবাড়ীতে অদ্যাপিও মহাপ্রভুর সেই দ্বিভুজমূর্তি পূজিত হইতেছেন। এইস্থানেও নিতাই গৌরাঙ্গ পাশাপাশি রহিয়াছেন। নিত্যানন্দের একটি হস্ত ঊর্দ্ধে এবং অপরটি নিম্নে প্রসারিত আর গৌরাঙ্গের অজানুলম্বিত দুইটি হস্তই ঊর্দ্ধে প্রসারিত। নিতাই গৌরাঙ্গের সেই অপূর্ব সুন্দর শ্রীমূর্তি দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে মনোপ্রাণ জুড়াইয়া যায়। এখানে উল্লেখ্য যে, রথযাত্রাকালে জগন্নাথদেবের মাসীবাড়ী যাওয়ার মত প্রতিবৎসর পৌষ সংক্রান্তির পূর্বদিন নিতাই গৌর এবং বলরাম এই তিন বিগ্রহ বনোয়ারীবাদ রাজবড় বাড়ী হইতে উদ্ধারণপুরে আগমন করেন এবং তদুপলক্ষে সেখানেও সপ্তগ্রামের মত অগণিত ভক্তপ্রাণ সমাগমে অত্যন্ত আনন্দমুখর মহোৎসব হইয়া থাকে। অতঃপর উৎসব শেষে বিগ্রহত্রয় পুনরায় বনোয়ারীবাদ রাজবাড়ীতে প্রত্যাবর্তন করেন। উদ্ধারণপুরে গঙ্গার ধারে উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের একটি প্রস্তর বিগ্রহ এবং কিছুটা দূরে মেলার মাঠে দত্ত ঠাকুরের সমাধিবেদীও বিরাজমান রহিয়াছে। সেই সমাধিবেদীর পার্শ্বে তালাবন্ধ যে দুইটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ দৃষ্ট হয় সেখানে সেইসময়ে উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর নিত্যদিন ভোগ রন্ধন করিয়া নিতাই গৌরাঙ্গের সেবা দিতেন। সমাধিস্থলটি প্রাচীরে ঘেরা। সেই প্রাচীরের বাহিরে অশীতিপর বৃদ্ধের শ্মশ্রুর মতই একটি বটবৃক্ষ হইতে ঝুরি নামিয়া আসিয়াছে। আর তাহার পার্শ্বে লালে লাল একটি কৃষ্ণচূড়াবৃক্ষ এমন ভাবেই দণ্ডায়মান রহিয়াছে যে, দেখিয়া মনে হয় যেন বৃক্ষটি লালফুলের গুচ্ছ প্রস্তুত করিয়াই উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের সমাধির উপরে তাহার শাখারূপ হস্ত প্রসারণের মাধ্যমে অর্ঘ্য নিবেদন করিতেছে।

এই সমাধি প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর ১৪৬৩ শকাব্দে অগ্রহায়ণী কৃষ্ণা দ্বাদশীতে শ্রীধাম বৃন্দাবনে দেহরক্ষা করিলে তাঁহার দেহটি বংশীবটের নিকটে সমাধিস্থ করা হয় এবং সেই স্থানের সেই সমাধিটি অদ্যাপিও সেখানে বর্তমান রহিয়াছে। অতীব আশ্চর্যের বিষয় এইভাবে যুগপৎ সপ্তগ্রাম, উদ্ধারণপুর এবং শ্রীবৃন্দাবন এই তিনটি স্থানেই উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের সমাধি দৃষ্ট হইয়া থাকে।

প্রতি বৎসর ১লা মাঘ বর্দ্ধমান জেলার কেতুগ্রাম থানার অন্তর্গত উদ্ধারণপুর গ্রামে উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের আবির্ভাব উপলক্ষে মহাসমারোহে মহোৎসব হইয়া থাকে। অর্থাৎ এক বৎসরের মধ্যে অগ্রহায়ণী শুক্লা ত্রয়োদশীতে আদিসপ্তগ্রাম, পৌষ সংক্রান্তিতে কাটোয়ার নিকটে উদ্ধারণ পুর এবং ১লা মাঘ কেতুগ্রাম থানান্তর্গত উদ্ধারণপুরেও মহাসমারোহে মহাউদ্দীপনার সহিত মহা মহোৎসব হইয়া থাকে। অর্থাৎ এক মহামানবকে লক্ষ্য করিয়া বৎসরে তিনস্থানে পৃথকভাবে মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এমন একটি দৃষ্টান্ত সমগ্র অধ্যাত্ম জগতে আর একটি আছে বলিয়া আমার জানা নাই। তাই ইহাতেই উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর যে কত বড় একজন উচ্চকোটি বৈষ্ণবপ্রাণ ছিলেন তাহা অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

যাহা হউক, হে পাঠকগণ! এখন আমরা পুনরায় সপ্তগ্রামে নিত্যানন্দ প্রভুর নিকটে ফিরিয়া আসি। তিনি সপ্তগ্রামে বেশ কিছুদিন অবস্থান পূর্বক নামপ্রেম প্রচারের মাধ্যমে অসংখ্য অধম পতিতকে উদ্ধার করিয়া এত আনন্দ লাভ করিলেন যে, সেই আনন্দের প্রাবল্যে তিনি সপ্তগ্রাম হইতে সরাসরি শান্তিপুর শ্রীঅদ্বৈতালয়ে চলিয়া আসিলেন। অপ্রাকৃত চিন্ময় পরমানন্দের মূর্তিমন্ত বিগ্রহ নিত্যানন্দ প্রভুকে দেখিয়াই অদ্বৈত প্রভুর সে কি অপার আনন্দ! সেই আনন্দের আতিশয্যে তিনি শুধু বারংবার হরিবোল হরিবোল বলিতে বলিতে উদ্দণ্ড নৃত্য আর হুঙ্কার দিতে লাগিলেন। আর নিত্যানন্দ প্রভুকে পুনঃ পুনঃ দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে লাগিলেন। অতঃপর অদ্বৈত প্রভু যুক্তকরে নতস্কন্ধে নিত্যানন্দ প্রভুর যে স্তব স্তুতি করিলেন তাহার কিয়দংশ–

"মূর্খ নীচ অধম পতিত উদ্ধারিতে।
তুমি অবতীর্ণ হইয়াছে পৃথিবীতে ॥
যে ভক্তি বাঞ্ছয়ে যোগেশ্বর-সব মনে।
তোম' হৈতে তাহা পাইবেক যে-তে জনে ॥"

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত (৩/৫/৪৮৭-৪৮৮)

উল্লেখিত উক্তিরই জ্বলন্ত প্রতিমূর্তি উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর। অর্থাৎ নিত্যানন্দ প্রভুর করুণাশীর্বাদে সুবর্ণবণিককুলে আবির্ভূত হইয়াও দত্ত ঠাকুর দেবদুর্লভ প্রেমভক্তি লাভ করিয়া অবিকল রঘুনাথ, রূপ, সনাতনাদির

মত আচার্যত্ব লাভ করিয়াছিলেন। কেনই বা করিবেন না! কারণ নিত্যানন্দ প্রভু সপ্তগ্রাম হইতে বিদায় লইয়া শান্তিপুরে চলিয়া যাইতেই দত্ত ঠাকুর ঠিক যেন ষড়গোস্বামীর অন্যতম রঘুনাথ দাস গোস্বামীর মতই অতি কঠোর কৃচ্ছ্র সাধনায় আত্মনিয়োগ করিলেন। গ্রন্থের ভাষায়–

"তিন সন্ধ্যা সরস্বতীর জলে করে স্নান।
চব্বিশ প্রহর জপে রাধাকৃষ্ণ নাম ॥
অন্নজল ত্যাগ করি দুগ্ধ খাঞা রয়।
এক দণ্ড নিদ্রা সেহো সব দিন নয় ॥"

এইভাবে বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হইলে উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর তাঁহার একমাত্র পুত্র প্রিয়ঙ্করের* উপর (নিত্যানন্দ প্রভুর প্রদত্ত নাম শ্রীনিবাস) অঢেল বিষয় সম্পত্তি সমস্তই অর্পণ পূর্বক তৎকালীন সময়ে বর্দ্ধমান (বর্তমান বাঁকুড়া) জেলার অন্তর্গত কাইচারে যাইয়া মস্তক মুণ্ডন পূর্বক কৌপীন বহির্বাস গ্রহণ করিয়া গভীর মনঃসংযোগে সাধন ভজনে নিরত হন। এতদ্বিষয়ে তৎকালীন সময়ের প্রত্যক্ষদর্শী প্রখ্যাত পদকর্তা বাসুদেব ঘোষের লেখনীতে উল্লেখ আছে-

"কাইচারে কুটীর বান্ধি তাঁহা কৈল বাস।
মস্তক মুড়ায়া লইল কৌপীন বহির্বাস ॥
কণ্ঠে তুলসীর হার তিন গুচ্ছ থলি।
নাসাগ্রে তিলক পঙ্ক শোভা পায় ভালি ॥"

যাহা হউক, অতঃপর উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর কাটোয়া হইতে পাঁচ কিলোমিটার দূরে তাঁহারই নামে খ্যাত উদ্ধারণপুরে সুরধুনীর তটে এক অতি নির্জন স্থানে অবস্থান পূর্বক অহর্নিশি সদাসর্বক্ষণ ভজন সাধন করিতে লাগিলেন।

এখানে উল্লেখ্য তৎকালীন সময়ের সেই নির্জনস্থানে পরবর্তী সময়ে বাজার ঘাট নির্মিত হওয়ায় এখন লোকারণ্যে পরিণত হইয়াছে। বর্তমান সময়ে গঙ্গাতীরে শাঁখাই নামে যে বাজার দেখা যায়, বুঝিয়া লইতে হইবে এই স্থানেই উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের সেই নির্জন নীরব ভজনস্থলী।

এইভাবে বেশ কিছুদিন সেইস্থানে অবস্থান পূর্বক উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর আচার এবং প্রচার উভয় কর্মই করিতে শুরু করিলেন। অর্থাৎ নিত্যনিয়মিত ভজন সাধন করিতেন এবং ভগবৎ নাম ও কথা কীর্তনের মাধ্যমে ভগবৎ

মহিমাও তিনি প্রচার করিতে থাকেন। শুধু তাহাই নহে, এইভাবে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শক্তিতে শক্তিমান দত্ত ঠাকুর নিত্যানন্দ প্রভুকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া হরিনাম প্রচারেও বাহির হইলেন। বিশেষভাবে সুবিস্তীর্ণ কণ্টকনগরে (কাটোয়া) প্রতিটি গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া ঘুরিয়া হরিনাম প্রচার তো করিতেনই অধিকন্তু অনেকানেক গ্রামে মন্দির নির্মাণ পূর্বক নিতাই গৌরাঙ্গের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিলেন। শুধু তাহাই নহে, মহাপ্রভু এবং নিত্যানন্দ প্রভুর নাম মহিমাও প্রচার করিতে লাগিলেন এবং নিজেও নিজের নামাঙ্কিত গ্রামে অর্থাৎ উদ্ধারণপুরে মহাপ্রভু এবং নিত্যানন্দ প্রভুর বিগ্রহ স্থাপন পূর্বক নিত্যদিন নিষ্ঠা সহকারে সেবা পূজা করিতে লাগিলেন। গ্রন্থের ভাষায়–

"কণ্টকনগর মধ্যে যতনুঁ গ্রাম ছিল।
সর্বত্র প্রভুর মূর্তি উদ্ধারণ স্থাপিল ॥
সহস্র দেউলে নিত্যানন্দের বিগ্রহ।
শোভা পায় শ্রীচৈতন্যের দারুমূর্তিসহ ॥
ফুল তুলসী দিয়া দত্ত অতি ভক্তিভরে।
পরমযতনে প্রভুর নিত্য সেবা করে ॥
সর্বস্ব সঁপিয়া দিল সেবার প্রচারে।
ধন্য উদ্ধারণ দত্ত বানিয়ার ঘরে ॥"

তৎকালীন সময়ে উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর উদ্ধারণপুরে নিত্যানন্দ এবং গৌরাঙ্গের যে বিগ্রহ স্থাপন পূর্বক সেবার্চনা করিতেন সেই বিগ্রহ বর্তমানে বনোয়ারীবাদ রাজবাড়ীতে সেবিত হইতেছেন এই বিষয়ে ইতিপূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। এখন বিশেষভাবে উল্লেখনীয় যে, বর্তমান সময়ে উদ্ধারণপুর গঙ্গার ধারে শাঁখাই বাজার নামে যে একটি বাজার দেখা যায় সেই বাজারে সম্বৎসরই গঙ্গাপূজার সর্ববিধ সামগ্রী পাওয়া যায়। ইহার কারণ এখানে সম্বৎসর ধরিয়াই অনেকানেক ভক্তপ্রাণ গমনাগমন করেন এবং তন্মধ্যে অনেকেই এই বাজার হইতে পূজার সামগ্রী ক্রয় পূর্বক গঙ্গাপূজা করিয়া থাকেন। গঙ্গাপূজা কেন করেন, এই বিষয়ে একটি মনোপ্রাণ জুড়ানো জনশ্রুতি আমি বেশ কয়েকখানি গ্রন্থে অবলোকন করিয়াছি। তাহাতে আমার শুধুই মনে হয় ইহা জনশ্রুতি নহে, প্রকৃতই সত্য। সেই জনশ্রুতিটি নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণিত হইল।

পতিতপাবন নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপাঘনমূর্তি উদ্ধারণ দত্ত যখন উদ্ধারণপুরে অবস্থান করিতেন তখন একদিন এক শাঁখারি অত্যুচ্চকণ্ঠে **"শাঁখা চাই শাঁখা চাই "** বলিতে বলিতে গঙ্গাতীর দিয়া গমন করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে পূর্ণিমার চাঁদের মত সুন্দর অপরূপ রূপলাবণ্যময়ী এক বালিকা অকস্মাৎ আসিয়া শাঁখারিকে অত্যন্ত মিষ্টি কণ্ঠে বলিল – ও শাঁখারি! তুমি আমার হাতে একজোড়া খুব ভাল শাঁখা পরাইয়া দাওনা। এই কথায় অত্যন্ত প্রীত হইয়া অনিন্দ্যসুন্দরী সেই বালিকার দুই হাতে দুইটি শ্বেতশুভ্র অপূর্বসুন্দর শাঁখা সেই শাঁখারি পরাইয়া দিলেন এবং তাহাতে সেই সুন্দরী নারীমূর্তি অপূর্ব সৌন্দর্যে অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া উঠিলেন।

এখানে বলিতে ইচ্ছা জাগে শাঁখাসিন্দুরে রমণীদের সৌন্দর্য যতবর্দ্ধিত করে স্বর্ণালঙ্কারাদিতেও তত করে না। এক সময়ে শাঁখা, শাড়ী ও লোহা ভারতীয় সধবা মায়েদের শ্রেষ্ঠ ভূষণ ছিল। কিন্তু আজ পাশ্চাত্য প্রভাবে নিজ দেশের বিজ্ঞানময় বেশভূষা ও ভাষা ক্রমেই অবলুপ্তির পথে চলিয়াছে। ইহার ফলস্বরূপ দিকে দিকে দুর্দমনীয় ব্যভিচার মাথাচাড়া দিয়া উঠিতেছে।

যাহা হউক, বালিকাটির হস্তে শাঁখা পরাইয়া দিয়া শাঁখারি মূল্য চাহিলেন। তাহাতে বালিকা বলিল – এই গ্রামেই আমার পিতা উদ্ধারণ দত্ত থাকেন, তুমি একটু কষ্ট করিয়া তাঁহার নিকটে যাইয়া আমার কথা বলিয়া মূল্য চাহিয়া লইও।

ইহাতে শাঁখারি বলিলেন, তোমাকে যে আমি শাঁখা দিলাম এবং এই শাঁখার মূল্য যে কত তাহা তোমার পিতা কিভাবে বিশ্বাস করিবেন ?

এই কথা শ্রবণ করিতেই বালিকা বলিল, তুমি বলিবে পূর্ব ঘরের পশ্চিমের কুলুঙ্গিতে পাঁচটি স্বর্ণমুদ্রা আছে। তোমার মেয়ে তাহা দিতে বলিয়া দিয়াছে। আর তাহাতেও যদি আমার পিতা বিশ্বাস না করেন বা তোমাকে শাঁখার মূল্য না দেন তাহা হইলে তুমি এই স্থানেই চলিয়া আসিবে, আমি যে ভাবেই পারি তোমার শাঁখার মূল্য তোমাকে ঠিকই দিয়া দিব। আমাকে অবিশ্বাস করিও না। যাও। এখন আমার পিতা গৃহেতেই আছেন, বিলম্ব হইলে নামপ্রচারে চলিয়া যাইতে পারেন। শীঘ্র যাও। ইতিমধ্যে আমি এই নদীতে একটু স্নান করিয়া লই।

অনিন্দ্যসুন্দরী সেই বালিকার অতি প্রসন্নমধুর ও সুললিত কণ্ঠের কথাগুলি শ্রবণে শাঁখারি অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলেন এবং সেই আনন্দের দোলায় দুলিতে দুলিতেই যেন উদ্ধারণ দত্তালয়ে যাইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত দত্ত ঠাকুরকে বলিয়া শাঁখার মূল্য চাহিলেন। তাহাতে উদ্ধারণ দত্ত বলিলেন–তোমার কথার মাথামুণ্ডু আমি যে কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না, আমার তো কোন মেয়েই নাই।

এই কথায় শাঁখারি বলিলেন - দেখুন, আপনার মেয়ে নাই এই কথা কিন্তু আপনি আর একটি বারের জন্যও মুখে আনিবেন না। জানিনা, অত সুন্দর মেয়ের উপরে কেন আপনার এত রাগ হইয়াছে। শাঁখা পরায় আপনার মেয়ের হাত দুইখানির সৌন্দর্য যে কতগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা আপনি যখন নিজের চোখে দেখিবেন তখন আর আপনার রাগ একটুও থাকিবে না। কোটি কোটি জন্মের সুকৃতি না থাকিলে এমন লক্ষ্মীশ্রী মেয়ের পিতা হওয়া যায় না। তাই মেয়ের উপরে কোন প্রকার বিরক্তি না রাখিয়া আমার শাঁখার মূল্যটা দিয়া দিন।

পরমোদার প্রাণ উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের কোন কন্যা না থাকিলেও শাঁখারির এই কথাগুলি শ্রবণে তিনি অত্যন্ত প্রীত হইয়া বলিলেন,কত দাম তোমার শাঁখার?

উত্তরে শাঁখারি বলিলেন, পাঁচটি স্বর্ণমুদ্রা। তবে জানিবেন এই মূল্য কিন্তু আমি আপনার মেয়ের কাছে চাই নাই। আপনার মেয়েই এই মূল্যের কথা বলিয়া দিয়াছে। আরও বলিয়া দিয়াছে এই পাঁচটি স্বর্ণমুদ্রা আপনার পূর্বঘরের পশ্চিমে কুলুঙ্গিতে আছে।

এতচ্ছ্রবণে উদ্ধারণ দত্ত অত্যন্ত কৌতূহলী হইয়া তৎক্ষণাৎ গৃহমধ্যে নির্দেশিত স্থানে যাইয়া দেখিলেন – হ্যাঁ, ঠিকই তো, কিন্তু এ কি আশ্চর্য! কোথা হইতে কিভাবে এইস্থানে এই পাঁচটি স্বর্ণমুদ্রা আসিল ? এই ভাবনায় তিনি আথে ব্যথে বাহিরে আসিয়া শাঁখারিকে বলিলেন– কোথায় আমার মেয়ে, চলতো দেখি আমাকে দেখাবে ?

এই কথায় শাঁখারি উদ্ধারণ দত্তকে লইয়া গঙ্গার ঘাটে যে স্থানে তাঁহার মেয়েকে শাঁখা পরাইয়াছিলেন ঠিক সেইস্থানে আসিলেন। কিন্তু এ কি! গঙ্গার ঘাট যে সম্পূর্ণই শূন্য, সেখানে কেহই তো নাই। তাহাতে

উদ্ধারণ দত্ত শাঁখারিকে বলিলেন –কই, আমার মেয়ে কোথায় ? শীঘ্র দেখাও।

এই কথায় শাঁখারি কিঞ্চিৎ বিমর্ষ হইয়া বলিলেন – তখনতো আপনার মেয়ে আমাকে বলিয়াছিল যে সে গঙ্গায় স্নান করিবে। কিন্তু এখন তো আর তাহাকে দেখিতে পাইতেছি না। সে তো মিথ্যা বলিবে না। মনে হয় সে ঠিকই গঙ্গায় স্নান করিতে নামিয়া ডুব দিয়া আছে।

ইহাতে সদাশান্ত দত্ত ঠাকুর কিঞ্চিৎ ক্রোধের ভাব দেখাইয়া বলিলেন, ডুব দিয়া কতক্ষণ থাকা যায় ? আর স্নান করিতেই বা কত সময় লাগে ?

এই ক্রোধোক্তিটি শাঁখারির কর্ণে প্রবিষ্ট হইতেই তাঁহার নয়নদ্বয় অশ্রুসজল হইয়া উঠিল এবং ক্রন্দন বিজড়িত কণ্ঠে গঙ্গার দিকে তাকাইয়া বলিতে লাগিলেন – মাগো, তুমি এখন কোথায় আছ ? শাঁখার মূল্য না পাইলেও আমি কোন ক্ষতি মনে করি না। কিন্তু তুমি একটি বারের জন্য আমাকে একটু দেখা না দিলে আমি তোমার বাবাকে এখন কি দিয়া কিভাবে বিশ্বাস করাইব ? আমি যে তোমার বাবার কাছে তথা সমগ্র জগতের কাছেই চিরদিনের জন্য মিথ্যাবাদী হইয়া থাকিব।

এই কথাগুলি বলিতে বলিতে শাঁখারির নয়ন দিয়া শ্রাবণের বারিধারার মত দরবিগলিত ধারায় অশ্রু ঝরিতে লাগিল। আর ঠিক তখনই দেখা গেল মাঝগঙ্গা হইতে জলের উপরে দুইখানি নিটোল তপ্তস্বর্ণবর্ণ হস্ত উঠিয়া আসিল আর তাহাতে দুগ্ধবৎ ধব ধবে সাদা দুইটি শাঁখা স্পষ্ট হইয়া দেখা গেল। দৃশ্যটি দর্শন করিতেই দত্ত ঠাকুরেরও নয়নদ্বয় অশ্রুধারায় সিক্ত হইয়া উঠিল। আর তদবস্থায় তিনি শাঁখারিকে বলিলেন– শাঁখারি ভাই, তুমি সত্য সত্যই মহাভাগ্যবান। তুমি ত্রিলোকপাবনী মা গঙ্গার হাতে সাক্ষাৎ শাঁখা পরাইয়াছ, আর তোমার অন্তরের বিশুদ্ধ ভক্তিগুণে আমিও আজ মা গঙ্গার রূপ কিছুটা হইলেও প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইলাম। শাঁখারি ভাই তুমিই বল একি আমার কম সৌভাগ্যের কথা! আজ স্বয়ং মা গঙ্গা নিজেকে আমার কন্যারূপে পরিচয় দিয়া তোমার কাছে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং আমাকে কৃপা করিতে তোমাকে আমার নিকটে

পাঠাইয়াছিলেন। এই নাও ভাই, মা গঙ্গারই নির্দেশিত সেই পাঁচটি স্বর্ণমুদ্রা। এই পঞ্চমুদ্রা আমার নয়, আমার মাধ্যমে মা গঙ্গাই তোমাকে দিয়াছেন।

কিন্তু উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের এই অনুরোধ সত্ত্বেও শাঁখারি সেই পঞ্চ স্বর্ণমুদ্রা গ্রহণ করিলেন না। গদ্গদ কণ্ঠে বলিলেন –কাঞ্চন ফেলিয়া এই কাঁচ লইয়া আমি কি করিব ? হায় হায়! আমি এতই নির্বোধ ও হতভাগ্য যে, তখন আমি মা' কে চিনিতেই পারি নাই।

যাহা হউক, ঠাকুর উদ্ধারণ দত্তের দিব্য জীবনলীলায় পরিলক্ষিত হয় একবার তিনি গৌড়দেশ হইতে নীলাচলে যাইয়া শ্রীমন্ চৈতন্য মহাপ্রভুর সহিতও মিলিত হইয়াছিলেন আর তাঁহাকে পাইয়া মহাপ্রভুর সে কি অপার আনন্দ! মহাপ্রভু দত্ত ঠাকুরকে একটানা ছয় মাস নীলাচলে রাখিয়া দিয়াছিলেন। সেই সময়ে নিত্যানন্দ প্রভুর মত মহাপ্রভুও যে বিশুদ্ধ চিত্ত দত্ত ঠাকুরের হাতে ভোজন করিয়াছিলেন তাহারও প্রমাণ ভক্তিগ্রন্থে পাওয়া যায়। অথবা প্রমাণেরইবা কি প্রয়োজন ? নিত্যানন্দ প্রভু যেখানে উদ্ধারণ দত্তের হস্তের রান্না ভক্ষণ করিতেন সেখানে তাঁহার অভিন্ন তনু বা তত্ত্ব মহাপ্রভু যে করিতেই পারেন তাহাতে আর সন্দেহের কি থাকিতে পারে ?

এইভাবে নীলাচলে মহাপ্রভুর সেবায় অর্দ্ধবৎসর অবস্থানের পর প্রভুর অনুজ্ঞায় উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর পুনরায় গৌড়দেশে চলিয়া আসেন এবং প্রাণপণ প্রচেষ্টায় অনেকানেক স্থানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নামপ্রেম প্রচার করিতে থাকেন। এখানে উল্লেখ্য, ইতিপূর্বেই পতিতপাবন নিতাই চাঁদ অধঃপতিত যে সুবর্ণবণিককুলকে পরমাদরে কোলে তুলিয়া লইয়াছিলেন গৌড়দেশে আসিয়া দত্ত ঠাকুর সেই তাঁহার প্রাণারাধ্য নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে থাকিয়াও বহুস্থানে নামপ্রেম প্রচার করিয়াছিলেন এবং সেইকালে স্বহস্তে রন্ধনাদি সেবাকার্য করিয়া তিনি নিত্যানন্দ প্রভুকে সেবাও করিয়াছিলেন। একইভাবে শ্রীনিত্যানন্দ ঘরনী জাহ্নবা ঠাকুরাণীকেও দত্ত ঠাকুর দীর্ঘদিন ধরিয়া সর্বান্তঃকরণে সর্ব প্রযত্নে সেবাযত্ন করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে সুবিখ্যাত **"শ্রীশ্রীমুরলী বিলাস"** গ্রন্থে চতুর্দশ পরিচ্ছেদ হইতে সপ্তদশ পরিচ্ছদ পর্যন্ত অনেকগুলি পৃষ্ঠা আলোকোজ্জ্বল করিয়া সবিস্তারে যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহা অতি সংক্ষিপ্তাকারে এখানে একটু উপস্থাপিত করিতে অভিলাষী হইয়াছি।

শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুর দিব্য অন্তর্ধানের পর তদ্বিরহে নিতান্তই কাতর জাহ্নবা দেবী খড়দহে শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের সেবাপূজা লইয়াই দিনাতিপাত করিতেন। এমতাবস্থায় একদিন তিনি পরমাদরের পুত্র বীরচন্দ্রকে (বীরভদ্র) ডাকিয়া বলিলেন – বাবা! শ্রীধাম বৃন্দাবনে যাইয়া শ্রীগোবিন্দ ও গোপীনাথ দর্শন করিতে আমার মনে খুবই ইচ্ছা জাগিয়াছে। আবার শুনিলাম সেখানে মদনগোপালও প্রকটিত হইয়াছেন, তাই তুমি আমাকে একটু অনুমতি দাও আমি বৃন্দাবনে যাইয়া প্রাণ ভরিয়া তাঁহাদের দর্শন করিয়া আসি।

এখানে উল্লেখ্য, তৎকালীন সময়ে মনুসংহিতা মতে নিয়ম ছিল মেয়েরা বিবাহের পূর্বে পিতার অধীন, বিবাহের পর স্বামীর অধীন এবং স্বামীর অবর্তমানে পুত্রের অধীন থাকিতেন। ইহার প্রকৃত অর্থ উক্ত তিন অবস্থায় পর পর পিতা,স্বামী ও শেষে পুত্র মাতৃত্বকে রক্ষা করিতেন। অর্থাৎ অধীনতার উপর অধিক গুরুত্ব না দিয়া মাতৃত্বের রক্ষক ভাবিলে বিষয়টির প্রয়োজনীয়তা অতি স্পষ্ট হইয়া ওঠে। লৌকিক লীলায় স্বয়ং জগজ্জননী জাহ্নবা দেবী পর্যন্ত এই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মাতৃত্ব রক্ষার নিয়মের ব্যতিক্রম করেন নাই। এই একটি মাত্র কারণেই তিনি সেই সময়ে পুত্রকে অভিভাবক ভাবিয়া তাহার নিকটে বৃন্দাবন গমনের অনুমতি চাহিয়াছিলেন। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় কালের প্রাবল্যে শাস্ত্রীয় ভুল ব্যাখ্যার ফলে নারীস্বাধীনতার নামে দিকে দিকে ব্যভিচার মাথা চাড়া দিয়া উঠিতেছে।

যাহা হউক, মাতা জাহ্নবা দেবীর কথায় পুত্র বীরভদ্র কিঞ্চিৎ বিমর্ষ হইয়া বলিলেন– মাগো, তমি যে মায়ের জাতি, তাই এমন আর কে আছে যে তুমি তাহার সাথে বৃন্দাবন যাইবা, বরং আমিই তোমাকে সঙ্গে লইয়া যাইব। অন্যথায় অনেকদিনের পথে যদি কোন বিপদাপদ হয় তবে তোমাকে কে দেখিবে? আর তুমি চলিয়া গেলে তোমার অবর্তমানে গোটা খড়দহই যে গ্রীষ্মকালীন মধ্যাহ্ন মরুভূমির মত খাঁ খাঁ করিবে। আর বিশেষভাবে তোমার মত এত নিষ্ঠা সহকারে শ্যামসুন্দরের সেবাপূজাই বা কে করিবে ? একই সাথে এখানে যে অনেক ভক্তপ্রাণ আছেন তাঁহাদের অন্নজলই বা কে যোগাইবে ?

প্রাণপ্রিয় পুত্রের এই কথায় জাহ্নবা মাতা মৃদুহাস্যে বলিলেন–বাবা, দেখিবে কোন অসুবিধা হইবে না, শ্যামসুন্দরই সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। আর তুমি যে বলিলে এমন আর কে আছে যে আমার সঙ্গে যাইবে তাহাতে বলি রামাই আর তোমাতে কোনই প্রভেদ নাই। তাই–

"ইহারে সঁপিয়া দেহ মোর সঙ্গে,
কোনমতে কেহ নাহি করিবে ভ্রুভঙ্গে।
আর একজন আছে জগতে বিদিত,
উদ্ধারণ দত্ত তাঁহে আনহ ত্বরিত।
পূর্বে প্রভু*সঙ্গে তিঁহ সর্বতীর্থে গেলা,
তিঁহ সঙ্গে লয়ে যেতে না করিবে হেলা।"

পরমারাধ্যা জননীর এই উক্তি শ্রবণে বীরচন্দ্র অনেকটাই আশ্বস্ত হইলেন এবং উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরকে ডাকাইয়া আনিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। দত্ত ঠাকুর তাঁহার প্রাণারাধ্য নিত্যানন্দ প্রভুর মত সমান চ'ক্ষেই জাহ্নবা মাতাকে দেখিতেন, তাই নিত্যানন্দ প্রভুর মত জাহ্নবা মাতাকেও দীর্ঘদিন ধরিয়া কায়মনোপ্রাণে সেবাযত্ন করিবার ইচ্ছা থাকিলেও এতদিন তাহা হয় নাই, আজ সেই একান্ত কাঙ্ক্ষিত সুবর্ণ সুযোগ সমুপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া দত্ত ঠাকুর অত্যানন্দে আত্মহারা হইয়া উঠিলেন।

অতঃপর আর বিলম্ব না করিয়া রামাই পণ্ডিত এবং উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া জাহ্নবা দেবী ব্রজের পথে যাত্রা করিলেন। মুরলী বিলাস গ্রন্থের ভাষায়–

"আগে উদ্ধারণ দত্ত পশ্চাতে রামাই ;
তার মধ্যে চলি যান্ জাহ্নবা গোসাঞিঃ।"

এই উক্তিটিই ভাষান্তরে অন্য একখানি গ্রন্থে এইভাবে দেখিতে পাই–

"আগে উদ্ধারণ দত্ত মধ্যেতে শ্রীমতী,
পশ্চাতে রামাই চলে ভাবাবিষ্ট মতি।"

এই সমস্ত গ্রন্থোক্তিতে উদ্ধারণ দত্ত যে সেইকালে আগে আগে

---

* নিত্যানন্দ প্রভু

যাইতেছিলেন তাহা পরিষ্কার বোঝা যায়। আর ইহাতে মনে হয় ব্রজভূমির পথ সম্পর্কে উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর অধিক অবহিত ছিলেন। ইহাতে আরও মনে হয় দত্ত ঠাকুর জাহ্নবা মাতাকে প্রাণপণ প্রযত্নে রক্ষা করিয়া লইয়া যাইতেছিলেন।

যাহা হউক, এইভাবে বেশ কয়েকদিন ধরিয়া পদব্রজে চলিতে চলিতে পথে কোথাও পথশ্রম জনিত বিশ্রাম, কোথাও রাত্রিবাসের জন্য বাসাঘর ঠিক করা, রান্নাবান্না প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্যগুলি প্রায় সমস্তই দত্ত ঠাকুরই সম্পাদন করিতেন।

এইভাবে উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর এবং রামাই পণ্ডিতের প্রাণঢালা তত্ত্বাবধানে নিত্যানন্দ-শক্তি জাহ্নবা দেবী শ্রীধাম বৃন্দাবনে যাইয়া উপনীত হইলেন। আর তখনই উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর রূপ সনাতনাদি উচ্চকোটির বৈষ্ণবপ্রাণকে জাহ্নবা দেবীর ব্রজে আগমন সংবাদ জানাইয়া দিলেন। তাহাতে সকলেই যথাশীঘ্র আসিয়া শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুর শক্তিজ্ঞানে জাহ্নবা দেবীর শ্রীচরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণতি নিবেদন করিলেন। অতঃপর দত্ত ঠাকুরের স্থিরীকৃত বাসাতে অবস্থান পূর্বক জাহ্নবা দেবী উদ্ধারণ দত্ত এবং রামাই পণ্ডিতকে সঙ্গে লইয়া নিত্যদিনই ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা করিতে লাগিলেন। এইভাবে একদিন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থানে যাইয়া সভক্তিচিত্তে সাষ্টাঙ্গ প্রণতি নিবেদন করিতেই অত্যধিক প্রেমাবেশে দত্ত ঠাকুরের হৃদয়ে কৃষ্ণস্ফূর্তি মহাভাব জাগ্রত হইয়া উঠিল। বিষয়টি বুঝিতে পারিয়া তখনই জাহ্নবা দেবীর ইঙ্গিতে রামাই পণ্ডিত শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের একটি শ্লোক পাঠ করিলেন এবং তাহা শ্রবণে দত্ত ঠাকুর অপরিমিত প্রেমোন্মাদনায় কর্তিত বৃক্ষের মত ভূমিতলে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। এমতাবস্থায় তাঁহার দেহে স্তম্ভ, কম্প পুলকাশ্রুআদি বেশ কয়েকটি সাত্ত্বিক ভাবের বিকার একযোগে উপস্থিত হইল।
আর তাহা দর্শনের ফলশ্রুতিতে সেইস্থানে সমবেত সকলের মধ্যেই প্রেমাবেশ দেখা দিল এবং সেই

প্রেমাবেশে সবে মিলি করে হরিধ্বনি,
কৃষ্ণনাম বিনা অন্য নাম নাহি শুনি।

এইরূপে কতক্ষণ করিয়া দর্শন,
তথা হইতে রঙ্গভূমে করিলা গমন।
যাঁহা মল্লযুদ্ধ কৈলা কৃষ্ণ বলরাম,
যাঁহা বহুবিধ লোক দেখিলা ভগবান্ ।
যে মঞ্চে চড়িয়া কংস কৌতুক দেখিলা,
চানুর মুষ্টিক যুদ্ধ অপরূপ লীলা।
নন্দরাজ লয়ে যত গোপ গোপীগণ,
বসুদেব মহামতি লইয়া স্বগণ।
নিজ নিজ মঞ্চে বসি দেখে যুদ্ধরঙ্গ,
সেইস্থান দেখি বাড়ে প্রেমের তরঙ্গ।
জাহ্নবা কহেন রাম! পড় দেখি শ্লোক,
পড়েন রামাই শ্লোক শুনে সব লোক।"

পরমভক্তপ্রাণ রামাই পণ্ডিতের পঠিত সেই প্রেমোদ্দীপক শ্লোকটি এই–

"মল্লান্য মশানি নৃণং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্তিমান্
গোপানং যজনোহসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তাস্বপিত্রোঃ শিশুঃ
মৃত্যুর্ভোজ পতের্বিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পর যোগীনাং
বৃষ্ণীনাং পর দেবতেতি বিদিতো রঙ্গংগত সাগ্রজঃ ॥

অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন অগ্রজের সহিত কংসের রঙ্গস্থলে প্রবিষ্ট হইলেন, তখন সেখানকার মল্লগণ তাঁহাকে অতিকঠিন অশনির মত দর্শন করিল, সাধারণ মানুষেরা সুন্দর পুরুষ রূপে, রমণীগণ মূর্তিমান কন্দর্প রূপে, গোপগণ পরমাত্মীয় রূপে, দুষ্ট রাজন্যবর্গ শাসন কর্তারূপে, পিতামাতা শিশু সন্তান রূপে, একবারেই মূঢ়গণ সামান্য বালকরূপে, যোগীগণ পরমতত্ত্ব রূপে, যাদবগণ পরমদেবতারূপে এবং কংস সাক্ষাৎ কৃতান্ত রূপে অবগত হইলেন। পরমপ্রিয় রামাই পণ্ডিতের শ্রীকণ্ঠোদ্গীর্ণ এই–

"শ্লোক শুনি উদ্ধারণ প্রেমে মত্ত হৈলা,
পূর্বের সখ্যতা ভাব হৃদে উপজিলা।

বাহুতুলি ডাকে কাঁহা কানাই বলাই,
মুখ বাদ্য করে কত হাতে দেয় তাই।
কভু বা ভূমেতে পড়ে নেত্রে জল ধার,
দেখিয়া জাহ্নবা আনন্দ অপার।"

অর্থাৎ উল্লেখিত শ্লোকটি শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের মনে পূর্বলীলায় শ্রীকৃষ্ণ বলরামের সহিত তাঁহার যে অত্যন্ত প্রগাঢ় সখ্যভাবের পূর্বস্মৃতি তাহা স্পষ্টভাবে সম্পূর্ণই উদ্দীপিত হইয়া উঠিয়াছিল। আর সেই ভাবোন্মাদনায় দত্ত ঠাকুর দুই বাহু তুলিয়া অত্যুচ্চ কণ্ঠে – **"কানাই – কানাই"** ও **"বলাই – বলাই"** বলিয়া বারংবার ডাকিতে লাগিলেন এবং মুখবাদ্য করিয়া সজোরে হাতে তালিও দিতে লাগিলেন। আবার পরক্ষণেই ভূমিতলে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে দিতে অবিরল ধারায় প্রেমাশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। এই দৃশ্য দর্শনে বিষয়টির গূঢ় তাৎপর্য বুঝিয়া জাহ্নবা মাতা যারপরনাই আনন্দানুভব করিলেন।

ইহার অব্যবহিত পরই যখন দত্ত ঠাকুর কংসবধের স্থানটি অবলোকন করিলেন তখন তিনি সঙ্গে সঙ্গে কি কি ঘটনার মাধ্যমে কিভাবে শ্রীকৃষ্ণ কংসকে বধ করিয়াছিলেন সেই বৃত্তান্ত সমস্তই অনর্গল বলিয়া যাইতে লাগিলেন। এই সমস্ত ঘটনায় উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর যে প্রকৃতই পূর্বলীলায় কৃষ্ণবলরামের সখা ছিলেন তাহা রৌদ্রোজ্জ্বল মধ্যাহ্নের মত পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায়। আর তাই তাঁহার প্রেমোজ্জ্বল শ্রীচরণে মনে প্রাণে প্রণতি নিবেদন পূর্বক বলিতে ইচ্ছা হয় – প্রভুগো, তোমার এই কৃষ্ণ প্রেমোজ্জ্বল ভাবধারার কণামাত্র দান করিয়া মাদৃশ পতিতকে ত্রাণ কর।

যাহা হউক, হে পরমপ্রিয় ভক্তপ্রাণ পাঠক ও পাঠিকাগণ! এইভাবেই শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-শক্তি মা-জাহ্নবা এবং তাঁহার পুত্রসম প্রিয় দুই ভক্ত রামাইপণ্ডিত এবং উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের শ্রীধাম বৃন্দাবন ভ্রমণ বৃত্তান্ত শ্রীশ্রীমুরলীবিলাস গ্রন্থখানিতে সবিস্তারে বর্ণিত আছে। গ্রন্থখানি সংগ্রহপূর্বক তাহা অধ্যয়ন করিতে আপনাদের সকলের নিকট সবিনয় অনুরোধ জানাইতেছি।

অতঃপর উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের দিব্য জীবন কাহিনীতে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, সেইবারে তিনি ব্রজধাম হইতে গৌড়দেশে ফিরিয়া

আসিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার পর দ্বিতীয়বারে তিনি যখন বৃন্দাবন গিয়াছিলেন সেইবারে আর ফিরিয়া আসেন নাই। সেইবারে অর্থাৎ ১৪৬৩ শকাব্দে অগ্রহায়ণী কৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে তিনি বৃন্দাবনেই দেহরক্ষা করেন। ঘটনা প্রবাহে মনে হয় দ্বিতীয়বারে তিনি যেন শুধু দেহরক্ষার জন্যই বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। শুধু তিনি কেন, অত্যন্ত লক্ষণীয় বিষয় রূপ সনাতনাদি ভগবৎ পার্ষদগণের যিনি যেখানেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রায় সকলেই শেষে ঘটনাক্রমে ব্রজে আসিয়া ব্রজেই দেহরক্ষা করিয়াছিলেন। ইহাতে মনে হয় নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ পরিকরগণ হরিনাম প্রচারের মাধ্যমে জীবোদ্ধার করিতে নিত্যধাম হইতে ধরাধামে আসিয়া স্ব স্ব কার্য সমাপনান্তে ব্রজধামে লীলা সাঙ্গ করিয়া আবার সেই নিত্য ব্রজভূমিতেই ফিরিয়া গিয়াছিলেন। এইভাবে অনন্তকাল ধরিয়া তাঁহাদের নিত্যকালের নিত্যলীলাখেলা অব্যাহত আছে।

যাহা হউক, শ্রীধাম বৃন্দাবনে দেহরক্ষার পর উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের দিব্য দেহকে শ্রীধাম বৃন্দাবনেই বংশীবটের নিকট সমাধিস্থ করা হয়, যাহা সেইস্থানে অদ্যাপিও দেখা যায়। আর তাহা দেখিয়া মনে হয় – যুগপৎ দত্ত ঠাকুর ও তাঁহার সমাধি যেন সমাগত সকলকে নির্বাক ইঙ্গিতে ডাকিয়া নিত্যনিয়তই বলিয়া চলিয়াছেন – হে কলির ত্রিতাপগ্রস্ত জীব, তোমরা তোমাদের সমস্ত সংসার কর্মের মধ্যে থাকিয়াও পতিততারণ মহানামকে নিত্যসঙ্গী করিয়া অবিরাম গতিতে গাহিয়া চল–

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥"